AN
Encyclopedia of Hindu Midwifery as known and discovered by the ancient Hindus.

আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা।

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত, সংশোধিত এবং পরিবর্দ্ধিত,

ও

তৎকর্ত্তৃক জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৫৪/২/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, আর্য্যযন্ত্রে,

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

চৈত্র, ১২৯৯ সাল।

বিজ্ঞাপন।

প্রীতির কুসুম—বহু যত্নে, বহু পরিশ্রমে আয়ুর্ব্বেদ-সমুদ্র হইতে উত্তোলন করিয়া দৃশ্যপ্রাঙ্গণে রোপণ করিলাম। ইহারই সৌরভে এক সময় হিন্দুজগৎ মোহিত হইয়াছিল। অধুনা বহুকাল অতলতলে নিমগ্ন থাকায় পূর্ব্বভাবের অভাব হওয়াই নিতান্ত সম্ভব। দেশীয় মহাত্মাগণ একবারমাত্র কৃপা-কটাক্ষে আমাকে উৎসাহ প্রদান করিলে শীঘ্রই যে আবার দেশীয় ধাত্রীবিদ্যা জন-সমাজে সমাদৃত হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। বাঙ্গালী জাতি বিদেশের উন্নতি-কল্পে—বিদেশীয়-দিগের প্রসাদ লালসায় রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিতে পারেন, *অকিঞ্চিৎকর উপাধির জন্য চিরসঞ্চিত ধনেও জলাঞ্জলি দিতে* পারেন, কিন্তু স্বদেশের জন্য—স্বদেশবাসীর উপকারের জন্য সামান্য দুই একটী বাক্য ব্যয করিতেও কেহ প্রস্তুত নহেন। ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে? পূর্ব্বতন হিন্দুগণ স্ত্রীলোকসম্বন্ধীয় কোন কথাই সাধারণের শ্রুতি-গোচর করিতেন না। তাহাতে তাঁহারা সাতিশয় লজ্জা জ্ঞান করিতেন। তাই স্ত্রীলোকদিগের ধাত্রীবিদ্যাও সাধারণ চিকিৎসাগ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই। গোপনীয় তন্ত্রাদিতেই ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সেই সকল তন্ত্রশাস্ত্রও সর্ব্বদা সুপ্রাপ্য নহে। তবে যতদূর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া "আয়ু-র্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা" নামে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের অবতারণা করা গেল। এইক্ষণ এতদ্দ্বারা দেশীয় লোকের সামান্য উপকার

হইলেও সমুদায় যত্ন ও শ্রম সফল জ্ঞান করিব। এবং বারান্তরে ইহার উন্নতিকল্পে যথোচিত চেষ্টা পাইব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণবিষয়ে বহুশাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য না হইলে কখনও ইহা জনসমাজে প্রকাশিত হইতে পারিত না। "সর্ব্বমঙ্গল-পতি তাঁহার মঙ্গল-বিধান করুন।" ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র শর্ম্মা।

সাং উমারপুর।

উপক্রমণিকা।

যিনি বীর্য্যরূপে একবার পুংজননেন্দ্রিয় হইতে মাতৃ-গর্ভে প্রবেশ করেন, আবার আর্ত্তবরূপে তাহারই সহিত সংমিলিত্ হইয়া কি প্রকার অত্যাশ্চর্য্য বিশ্ব-বিমুগ্ধকর সৃষ্টিকৌশল প্রদর্শন করেন! যাঁহার করুণা-কটাক্ষে জরায়ু-মধ্যে জীবগণ প্রতিনিয়ত নিরাপদে রক্ষিত, তিল তিল বর্দ্ধিত এবং যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া এই বিশাল সংসারেকে বহু-জনাকীর্ণ সুখের ভাণ্ডার করিয়া তুলি-য়াছে, যিনি মানববুদ্ধির অগম্য, অপার্থিব পদার্থে আশ্চর্য্য কৌশলে অপূর্ব্ব মায়া-জাল বিস্তার করিয়া জীবগণকে পরস্পর আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই পরম পিতা পরমেশ্বরকে একান্ত ভক্তিসহকারে নমস্কার করিয়া এই "আয়ুর্ব্বেবেদোক্ত ধাত্রী-বিদ্যা" আজ জন-সমাজে প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। জানি না, ইহাতে সাধারণের কতদূর উপকার হইবে। তবে উপকার হউক, আর নাই হউক, পবিত্র আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র যে কোন অংশে হীন নহে, যাহা কিছু মনুষ্য-জীবনের আবশ্যকীয়—অবশ্য জ্ঞাতব্য, তৎসমস্তই ইহাতে বিশদরূপে বর্ণিত আছে। ইহার একটী কথাও যে অমূল্য বা নিষ্প্রয়োজনীয় নহে, তাহাই যথাসাধ্য প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য। আজ ভার-

তের কি দুর্দ্দিন—হতভাগ্য ভারতবাসীর কি মহাবিপ্লব উপস্থিত! যে ভারতে একদিন সন্তান ভূমিষ্ঠ না হইলে প্রসূতির প্রসব-বেদনার কথা স্ত্রীলোক ভিন্ন বাটীস্থ পুরুষেরাও জানিতে পারিত না, অথচ সন্তান বা প্রসূতিরও কিছুমাত্র অনিষ্ট হইত না। হায়! বলিতে লজ্জা করে, আবার ঘৃণাও হয়, সেই ভারতের রমণীকুল আজ কিনা মেডিকেল কলেজের ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত ধাত্রী না হইলে সন্তান প্রসব করেন না! প্রসব-সম্বন্ধে একটু ব্যাঘাত জন্মিলেই সিভিল্ সার্জ্জনের সাহায্য না হইলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না। আবার অবস্থাভেদে শস্ত্রদ্বারা গর্ভ বিদীর্ণ না করিলেও কখন প্রসূতির জীবন রক্ষা পায় না। তাই বলি, হায়! ভারতের কি দুর্দ্দিন! হৃত-সর্ব্বস্ব ভারতভূমে এখনও এমন দুই একটী কার্য্যকুশলা জনয়িত্রী বিরাজ করিতেছে যে তাহাদিগের অসাধারণ-কার্য্যকারিতার কথা শ্রবণ করিলে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। যেরূপ অবস্থায় ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ধাত্রাগণ একবারে হতাশ হইয়া পড়েন, সুশিক্ষিত ডাক্তারগণ অস্ত্র দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বাহির না করিলে পদে পদে প্রসূতির বিপদ আশঙ্কা করেন, সেরূপ অবস্থায়ও দেশীয় নিরক্ষর জনয়িত্রীগণ কেবলমাত্র দুই একটী গাছড়া ঔষধের সাহায্যে সজীবসন্তান প্রসব করাইয়া থাকেন, তাহা স্পষ্ট দেখা গিয়াছে। সেই সকল ধাত্রী-

দিগের নিকট কি পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানিনী ধাত্রীগণ স্থান পাইতে পারে ?—না তাহাদিগের সঙ্গে তুলনাই করা যায় ? এমন কি, প্রাচীন হিন্দুপরিবারের মধ্যে যাঁহারা গৃহিণী ছিলেন, তাঁহারাও এ বিষয় অনেক জানিতেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে পবিত্রচেতা হিন্দুরমণীদিগের ঘরের কথা বাহির হইবার নিয়ম নাই, বাহির করিতেও তাঁহারা নিতান্ত লজ্জাবোধ করিতেন, তাই হিন্দুদিগের এই দুর্দ্দশা,—তাই হিন্দুদিগের ধাত্রীবিদ্যা আজ লুপ্তপ্রায়। সেই লুপ্ত-ধন—হিন্দুপরিবারের অমূল্য রত্ন, নানা তন্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া আজ সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেছি ! ইহাতে পাশ্চাত্য-শিক্ষাভিমানী সভ্য মহোদয়গণের মতবিরোধী অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যাইবে, অনেকস্থলে শান্তি স্বস্ত্যয়নাদির কথাও উল্লেখ থাকিবে ; এবং অবস্থানুসারে ঔষধ-প্রয়োগের বিষয়ও বিবৃত হইবে।

এস্থলে আরও একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যঋষিগণ যখন যে বিষয় লিখিয়াছেন বা আলোচনা করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক বিষয়েই সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক্ বা পরোক্ষ ভাবেই হউক্, কিছু না কিছু ধর্ম্মভাবের আভাস দিয়া গিয়াছেন ; ফলতঃ এই অনিত্য সংসারে যে একমাত্র মঙ্গলময়ের অমৃতময় নামটীই নিত্য, তাহা তাঁহাদিগের প্রত্যেক কথাতেই জাজ্জ্বল্যমান প্রকাশ

পাইয়াছে। যে প্রকারেই হউক না কেন, বিশ্বনিয়ন্তার অমৃতময় নামটী দুইবার বেশি করিয়া কীর্ত্তন করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল। তাই তাঁহাদের ধাত্রীবিদ্যাও হরপার্ব্বতীর গল্পচ্ছলে লিখিত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা।

প্রথম অধ্যায়।

একদা ভূত-ভুবন ভগবান্ ভবানী-পতি প্রিয়তমা পার্ব্বতীর সহিত সুরম্য কৈলাস-কাননে ভ্রমণ করিতেছিলেন, ক্ষণকালের জন্য যোগ-তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া প্রণয়িনীর সহিত পবিত্র প্রণয়ের অমৃত-রস পান করিতেছিলেন। উভয়ের মধ্যে কতই রহস্যালাপ হইতে লাগিল। পরে পতিসোহাগিনী পার্ব্বতী বিনয়-নম্রবচনে কহিলেন, 'হৃদয়বল্লভ! আজ একটা বিষয় জানিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে। রমণীগণ গর্ভধারণ অবধি নিত্য নূতন কত প্রকারের যন্ত্রণাই ভোগ করিয়া থাকে, আবার প্রসবের সময় কখনই নিরাপদে পুত্র-মুখ দেখিতে পায় না। কেহবা সেই সময়েই সমুদায় লীলা-খেলা সাঙ্গ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়, কেহবা বহু কষ্টে নিজের জীবন রক্ষা করিয়াও অমূল্য রত্ন পুত্রধনে বঞ্চিত হয়। তবে কি এই সমস্ত বিপদ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার কোনও প্রশস্ত উপায় নাই?

যোগনাথ! সংসারে তোমার অজ্ঞাত কিছুই নাই—তুমি সর্ব্বজ্ঞ—সর্ব্বময়; অতএব দয়া করিয়া শরীরীদিগের হিতের জন্য এই বিষয় গুলি সরল ভাষায় আমাকে বুঝা-ইয়া দাও।'

এই কথা শুনিয়া মঙ্গলময় মহাদেব কহিলেন, 'প্রিয়ে! আজ তুমি এরূপ বলিতেছ কেন? যাহা আমি জানি, তাহা কি তোমার জানিতে বাঁকি আছে? আমাতে আর তোমাতে কি কিছুমাত্র ভিন্নভেদ আছে? আমিই ত তুমি হইয়া সংসারে পবিত্র প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছি, সংসারী হইয়াও যে অনায়াসে ব্রহ্মপদ লাভ করা যায়—ভগবানে চিত্ত সংযম করা যায়, তাহা দেখাইতেছি। আমিই ত তুমি হইয়া এই বিশাল জগৎ প্রসব করিয়াছি। অতএব হে জগৎপ্রসবিনি! তুমি কি সুখ-প্রসবের উপায় অবগত নহ? অনন্ত সন্তানের জননী হইয়াও কি তুমি সন্তান পালনের বিষয় জাননা?'

পার্ব্ব। জানি, কিন্তু আমি রমণী—স্ত্রীস্বভাব-সুলভ চঞ্চলতায় পরিপূর্ণ। আমার জানা না জানা সকলই ত তোমাতে অর্পিত। তোমা অপেক্ষা আমিই যদি আজ বিজ্ঞাভিমানিনী বলিয়া পরিচিতা হইতে ইচ্ছা করি, তবে আর তোমার শ্রেষ্ঠত্ব থাকিল কোথায়? অতএব তোমার মুখ হইতে প্রকাশ হওয়াই উচিত।

মহা। প্রিয়ে! বুঝিয়াছি, পাতিব্রত্যই তোমার

এরূপ বলিবার কারণ। আজ তোমার অনুরোধে শরীরী-দিগের হিতের জন্য সাঙ্গ ধাত্রীবিদ্যা প্রকাশ করিব।

শ্রবণ কর—

গর্ভের প্রথম মাসে শুক্র ও আর্ত্তব যেরূপ তরল অবস্থায় গর্ভাশয়ে পতিত হয়, ঠিক্ সেইরূপই থাকে। সেই সময় গর্ভের কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না। এমন কি, অদূর-দর্শিনী স্ত্রীমাত্রেই গর্ভের অস্তিত্ব বুঝিতে পারে না। সুতরাং সেই সময় গুর্ভিণীর কোন ব্যায়রাম হইলে বিশেষ করিয়া তাহার অনুধাবন করিতে হইবে। যদি গর্ভ হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় জানা যায়, এবং সেই গর্ভের বেদনা হয়, তাহা হইলে—শ্বেতচন্দন, শুল্‌ফা, চিনি ও ময়না ফল, চাউল ধোওয়া জলের সহিত বাঁটীয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সহিত গুলিয়া গর্ভিণীকে পান করাইবে। অথবা তিল, পদ্মকাষ্ঠ, শালুক, শালী তণ্ডুল, এই সমুদয় দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া চিনি, মধু ও দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহা জীর্ণ হইলে দুগ্ধান্ন ভোজন করাইবে। যদি প্রথম মাসে রক্ত ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে যষ্টিমধু, মাকড় চাউলী শাকের বীজ, ক্ষীরকাঁকলা ও দেবদারু সমভাগে দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে।

দ্বিতীয় মাসে জরায়ুস্থ মহাভূত, বায়ু, পিত্ত ও কফের সহিত পচ্যমান হইয়া অপেক্ষাকৃত ঘন হয়। এই সময়

হইতে কিছু কিছু করিয়া গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পায়, এবং গর্ভিণীর মাসিক রজঃস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। অনুপযুক্ত আহার বিহারাদি দ্বারা গর্ভে বেদনা হইলে পদ্ম, পাণিফল ও কেশুর, চাউল ধোওয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া তাহারই সহিত সেবন করাইবে। তাহাতে গর্ভদোষ রহিত হইয়া স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়। আবার রক্ত ভাঙ্গিতে থাকিলে কুলত্থ কলাই, কৃষ্ণ তিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী পূর্ব্ববৎ দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে।

তৃতীয় মাসে, হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মস্তক, এই পাঁচটী অবয়বের স্থলে পাঁচটা মাংস-পিণ্ড জন্মে এবং সূক্ষ্মরূপে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল দৃষ্ট হয়। এই সময় হইতে গর্ভের বাহ্যিক লক্ষণ সমস্ত স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইতে আরম্ভ হয়, গর্ভিণী সর্ব্বদাই অসুখে থাকে, সর্ব্বদা আলস্য ও তন্দ্রা হয়। তাহার কিছুই খাইতে ইচ্ছা হয় না, কেবল সময় সময় বমন বা বমনোদ্রেক হয়। অধিকন্তু পোড়া মৃত্তিকা ও অম্লরসে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। যদি তৃতীয় মাসের শেষে বা চতুর্থ মাসের প্রথমে গর্ভিণীর রক্তস্রাব আরম্ভ হয়, তবে সেই গর্ভ রক্ষা করা একটু কঠিন হইয়া পড়ে। অতএব রক্তস্রাব নিবারণার্থ তৃতীয় মাসে গুলঞ্চ, ক্ষীরকাঁকলা, নীলোৎপলি ও অনন্ত মূল, কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে। আবার এই সময় যদি গর্ভে বেদনা উপস্থিত

হয়, তাহা হইলে পদ্ম, কুড় ও শালুক, এই কয়েকটী বস্তু চিনির জলের সহিত পেষণ করিয়া গর্ভিণীকে পান করাইবে। ইহাতে শীঘ্র গর্ভ প্রকৃতিস্থ হয়।

চতুর্থমাসে গর্ভস্থ সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় এবং তাহার হৃদয় জন্মে ও চেতনার আবির্ভাব হয়। এই মাসে হৃদয় জন্মে বলিয়া গর্ভিণীর নানা বস্তুতে অভিলাষ হয়। সেই সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ না করিলে গর্ভস্থ সন্তান কুব্জ, কুণি, ষণ্ড, বামন, বিকৃতাক্ষ বা অন্ধ হয়, অথবা বীর্য্য-হীন ও অল্পায়ু হইয়া থাকে। সুতরাং গর্ভিণীর ইচ্ছানুরূপ বস্তু সকল তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রদান করা কর্ত্তব্য। নতুবা গর্ভিণীর যে যে অভিলাষ পূর্ণ না হয়, সন্তানের ও সেই সেই ইন্দ্রিয়ের পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা।

এই কথা শুনিয়া পার্ব্বতী কহিলেন, 'প্রভো! গর্ভিণীর যে যে অভিলাষ জন্মিলে গর্ভস্থ সন্তানের প্রকৃতিগত যে যে বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে, তাহাও বিশেষ করিয়া শুনিতে ইচ্ছা করি।'

তখন মহাদেব কহিলেন, প্রিয়ে! 'গর্ভিণীর রাজদর্শনে অভিলাষ জন্মিলে সন্তান সৌভাগ্যশালী ও ধনবান হয়, পট্টবস্ত্র ও অলঙ্কারে ইচ্ছা হইলে সন্তান সুকুমার ও অলঙ্কারপ্রিয় হয়, আশ্রম-গমনে অভিলাষ জন্মিলে সন্তান ধর্ম্মশীল ও সংযতাত্মা হয়, দেব-প্রতিমা

দর্শনে অভিলাষ জন্মিলে সন্তান প্রমথ-তুল্য রূপবান এবং সর্পাদি হিংস্র জন্তু দর্শনে ইচ্ছা হইলে সন্তান হিংস্রক হয়। আবার গর্ভিণীর যদি মহিষ-মাংস ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে রক্তাক্ষ, লোমশ ও বীর-পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। বরাহ মাংস ভোজন করিতে অভিলাষ হইলে নিদ্রালু ও বীর পুত্র জন্মে। মৃগ-মাংস ভোজনে ইচ্ছা হইলে পুত্র দ্রুতগামী, বিক্রমশালী ও বনচারী হয়। পূর্ব্বোক্ত জন্তু ভিন্ন গর্ভিণীর অন্য যে যে জন্তুর মাংস ভোজনে অভিলাষ জন্মে, সেই সেই জন্তুর আকার ও স্বভাব অনুসারে প্রসূত সন্তানেরও আকার ও স্বভাব হইয়া থাকে। এই সময় হইতে গর্ভিণীকে অত্যন্ত সাবধানে থাকিতে হইবে। অতিরিক্ত শৈত্য বা উষ্ণতা সেবন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। যে সমস্ত দ্রব্য আহার করিলে অনায়াসে পরিপাক হয়, তাহাই আহার করিবে। পচা দুর্গন্ধ বস্তু কদাচ খাইবে না। যাহাতে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করিবে। আবার কোন মতে উদরের পাড়া না জন্মে, তজ্জন্যও বিশেষ সাবধান থাকিবে। এই সময় গর্ভে বেদনা হইলে—

উৎপল, শালুক, কণ্টকারী, গোক্ষুর অথবা গো-ক্ষুর, কণ্টকারী, বালা ও নীলোৎপল, দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করাইবে। তাহাতে গর্ভদোষ রহিত হইয়া

স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়। রক্তস্রাব নিবারণার্থ অনন্তমূল, শ্যামালতা, রাস্না, বামুনহাটী ও যষ্টীমধু, দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া পান করাইবে। ইহা আশুফলপ্রদ।

পঞ্চম মাসে গর্ভস্থ সন্তান কেবল বর্দ্ধিত হয় এবং তাহার মন জন্মে। সুতরাং গর্ভ-মধ্যে সন্তানকে সময় সময় নড়া চড়া করিতে দেখা যায়। এই সময় গর্ভিণী অতিরিক্ত পরিশ্রম পরিত্যাগ করিবে; এবং একবারে নিশ্চেষ্ট হইয়াও বসিয়া থাকিবে না। এই সময় গর্ভিণীকে কুলপ্রথানুসারে যথাশাস্ত্র পঞ্চামৃতাদি পান করাইবে*। তাহাতে গর্ভের দোষ রহিত হয় এবং সর্ব্বগুণান্বিত সুকুমার সন্তান প্রসব হয়। পঞ্চম মাসে বেদনা নিবারণার্থ গর্ভিণীকে নীলোৎপল ও ক্ষীরকাঁকলা একত্রে পেষণ করিয়া দুগ্ধ, ঘৃত ও মধুর সহিত পান করাইবে। অথবা নীলোৎপল ও কাঁকলা সমভাগে শীতল জলদ্বারা পেষণ করিয়া পান করাইবে। রক্তস্রাব হইলে বৃহতী, কণ্টকারী, গাম্ভারীফল, বটের ঝুরি ও দারুচিনি সমভাগে বাঁটিয়া ঘৃতের সহিত পান করাইবে।

ষষ্ঠমাসে গর্ভস্থ সন্তানের বুদ্ধি জন্মে এবং শরীরও অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সময় হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত গর্ভিণীকে অত্যন্ত সাবধানে গমনাগমন

* শর্করা মধু দুগ্ধঞ্চ ঘৃতং দধি সমাংশকম্।
পঞ্চামৃতমিদং প্রোক্তং গর্ভশুদ্ধৌ বিধীয়তে॥

করিতে হইবে। উদরে কোন প্রকার চাপ না লাগে এবং কোন কারণে হঠাৎ গর্ভিণা ভয়-যুক্তা না হয়, তদ্বিষয় বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। নতুবা গর্ভ বিকৃত অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া উদরে শূল জন্মায়। তদ্রূপ অবস্থায় শূল হইলে গর্ভস্থ সন্তান কি প্রকার অবস্থায় গর্ভমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, তাহা বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সেই ভাবে একটু সরিষার তৈল গরম করিয়া তলপেটে মর্দ্দন করিবে। অথবা কোন কার্য্যকুশলা জনয়িত্রী দ্বারা গর্ভিণীর কটিদেশে একটু ঝাঁকি দিয়া গর্ভকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে। কিন্তু এই সমুদয় কার্য্য অতি সাবধানে করিতে হইবে। আহারাদি দ্বারা আভ্যন্তরীণ কার্য্যের বৈপরিত্য বশতঃ যদি গর্ভে বেদনা হয়, তাহা হইলে—টাবালেবুর বীজ, প্রিয়ঙ্গু, চন্দন ও উৎপল, গব্যদুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইবে। পিয়াল বীজ, দ্রাক্ষা ও খইচূর্ণ, শীতল জলের সহিত বাঁটিয়া পান করিলেও ব্যথা নিবারিত হয়। এই সময় রক্তভাঙ্গা আরম্ভ হইলে, চাকুলে, বেড়েলা, সজীনা-বীজ, গোক্ষুর ও যষ্টিমধু কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে।

সপ্তম মাসে শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়, গর্ভিণীর নানাবিধ মিষ্টস্বাদে অভিলাষ জন্মে এবং সেই অভিলাষ পূর্ণ করাও সকলের কর্ত্তব্য। কিন্তু

যাহাতে গর্ভের অনিষ্ট হয় বা প্রসবের কোন প্রকার বিঘ্ন জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে, এমন কোন বস্তু কখনও ভোজন করিতে দিবে না। সপ্তমমাস হইতে প্রসব না হওয়া পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে গর্ভিণীকে পায়েস প্রভৃতি মিষ্টান্ন ভোজন করিতে দিবে। এই প্রকার ভোজনকে সাধভক্ষণ কহে। পঞ্চম মাসে পঞ্চামৃত ভোজন করিতে না দিয়া প্রথম সাধভক্ষণের দিনেও কোন কোন স্থলে পঞ্চামৃত দেওয়ার নিয়ম আছে। এই সময় কোন যানাদিতে আরোহণ করিয়া দূরদেশে যাইবে না, কোন উচ্চ স্থানে আরোহণ বা নিম্ন স্থানে অবরোহণ করিবে না। এবং প্রসবকাল পর্য্যন্ত কোন মতেই একবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে না। অল্প অল্প অর্থাৎ পরিমিতরূপে প্রতিদিন শারীরিক পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য। নতুবা প্রসব-বাধা জন্মিতে পারে। সপ্তম মাসে গর্ভ-বেদনায় শতমূলী ও পদ্মমূল বাঁটিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে। অথবা কয়েদবেল, সুপারিমূল, খই ও চিনি, শীতল জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। রক্তস্রাবে পাণি-ফল, মৃণাল, দ্রাক্ষা, কেশুর, যষ্টিমধু ও চিনি, দুগ্ধের সহিত সেবনীয়।

সুবর্ণ সহস্রবার আধ্মাত হইলে যেরূপ বিশুদ্ধ হয়, সেইরূপ শরীরস্থ ভুক্ত বস্তুর রস বারম্বার পচ্যমান হইয়া বিশুদ্ধ শুক্রত্বে পরিণত হয়। তখন তাহার কিছুমাত্র

মল থাকে না। পরে সেই সারভূত রস, স্থূল ও সূক্ষ্ম দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এবং স্নেহময় সূক্ষ্ম ভাগই ওজঃ নামক অন্য পদার্থে পরিণত হয়। সেই ওজকেই শারীরিক বল কহা যায়। অষ্টম মাসে গর্ভস্থ সন্তানের সেই ওজের সঞ্চার হয়। এই মাসে গর্ভিণী এবং গর্ভস্থ সন্তান ক্ষণে ক্ষণে পরস্পর পরস্পরের ওজঃ গ্রহণ করিয়া থাকে। অষ্টম মাসে ওজের কোন স্থিরতা থাকে না বলিয়া সেই মাসে সন্তান হইলে প্রায়ই তাহাকে বাঁচিতে দেখা যায় না। বাঁচিলেও নিতান্ত দুর্ব্বল বা অল্পায়ু হইয়া থাকে। এতৎসম্বন্ধে তত্ত্বদর্শী বিজ্ঞগণ কহিয়া থাকেন যে, যখন সন্তান মাতার দেহ হইতে ওজঃ গ্রহণ করে, তখন সন্তান প্রফুল্ল ও মাতা ম্লান হয়, সেই সময় যে ভূমিষ্ঠ হয়, সে বাঁচিয়া থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু যখন মাতাই সন্তানের দেহ হইতে ওজঃ টানিয়া লয়, তখন সন্তান স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ ম্লান হইয়া থাকে। সেই সময় যাহার জন্ম হয়, কিছুতেই তাহার জীবন রক্ষা হয় না। সে যাহা হউক, সন্তান রক্ষার জন্য অষ্টম মাসে নৈঋত কোণের অধিষ্ঠাতা রাক্ষসের উদ্দেশে বলি প্রদান করা কর্ত্তব্য। উক্ত রাক্ষস গর্ভস্থ সন্তানের অংশভাগী।

এই কথা শুনিয়া অম্বিকা কহিলেন, ভূতনাথ! আমি এই কথার কোনও তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিলাম না। নৈঋত কোণের অধিষ্ঠাতা রাক্ষস কি প্রকারে গর্ভস্থ

সন্তানের অংশভাগী হইল ? আর এই রাক্ষসই বা কে ? এবং কেনই বা তাহার উদ্দেশে বলি প্রদান করিতে হইবে ?

মহা। ভূতেশ্বরি ! এই ভূতময় জগৎপ্রপঞ্চের প্রত্যেক ভৌতিক কার্য্যের বিষয়ই কি আজ তোমাকে নূতন করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে ? সংসারে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই ত একই উপাদানে উৎপাদিত হইয়াছে, সুতরাং প্রত্যেক বস্তুর সহিতই প্রত্যেক বস্তুর পরস্পর নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। তবে অবস্থাভেদে কোন কোন কার্য্যদ্বারা সেই সম্বন্ধ স্পষ্ট হয় এবং কোন কোন কার্য্য-দ্বারা কখনও তাহা লুপ্তপ্রায় থাকে।

অম্বি। হে চরাচর বিধাতঃ বিশ্বপতে ! অল্পবুদ্ধি মানব ত কখনই ইহার গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে পারিবে না, এবং তাহাহইলে আমার উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ সফল হইবে না।

মহা। প্রিয়ে ! সংসারে সকলেই সকল বিষয় সম্পূর্ণরূপ বুঝিতে পারে না। যাহারা বিচক্ষণ, তাহারাই অনায়াসে সমুদায় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়। অথবা আমার প্রতি বা শাস্ত্রে যাহাদের একান্ত ভক্তি আছে, তাহারাও কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারে। মেঘাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহারা বলিয়া থাকে যে মেঘরাশি সূর্য্যমণ্ডলকে আবৃত করিয়াছে,

তাহারাই অজ্ঞানতাবশতঃ প্রকৃত তত্ত্বকে অপ্রকৃত বলিয়া কল্পনা করে। সেই সকল অর্ব্বাচীনগণই হয়কে নয় বলিয়া নানাবিধ ব্যঙ্গোক্তি করিয়া থাকে। তাহারা এক বারও মনে করে না যে মেঘরাশি হইতে সূর্য্যমণ্ডল যত-দূরে অবস্থিত, তদপেক্ষা তাহাদের চক্ষুই ত অধিকতর নিকটবর্ত্তী। সুতরাং সমস্ত ভুবনপ্রকাশক ভগবান সূর্য্য-দেব আবৃত না হইয়া অল্পদর্শী তাহাদিগের চক্ষুইত আবৃত রহিয়াছে। অতএব এই বিশাল সংসারে রাক্ষস, নিশা-চর নামধারী কোন বস্তু আছে কিনা এবং তাহাদের সহিত গর্ভস্থ সন্তানের কোন নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে কি না, সেই সমস্ত অল্পবুদ্ধি মূঢ়গণ অথবা আত্মপক্ষ-সমর্থনকারী দাম্ভিকগণ তাহা কি প্রকারে বুঝিয়া উঠিবে? তবে দুই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিলে দুই একজন বুঝিলেও বুঝিতে পারে। কিন্তু তাহাই বা তাহারা চেষ্টা করে কোথায়? তাহারা ত আমাকেই বিশ্বাস করে না! তবে আমার কার্য্যই বা বিশ্বাস করিবে কেন?

অশ্বি। হে যোগমায়াধারিন্ মহাকাল! আর আমি বাহ্য কথা শুনিতে চাই না। উহা কখনও চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতিপন্ন নহে। যাহারা প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধিৎসু, তাহারা আপনারাই উহা বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিবে। যাহারা নিজে কিছু না বুঝিয়া "কেবল আমিহ সর্ব্বদর্শী,

আমিই সর্ব্বজ্ঞ” ইত্যাদি বলিয়া বৃথা জনসমাজে আস্ফালন করিয়া বেড়ায়, বক্তৃতার ঘন ঘটায় সকলকে মোহিত করিয়া আকাশ পাতাল কম্পিত করিয়া তুলে, শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব কখনই তাহাদিগের নিকট সত্য বলিয়া বোধ হইবে না। তাহারা যে প্রকার অন্ধকারে আছে, চিরকাল সেই প্রকার অন্ধকারেই থাকুক। তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। এক্ষণে দয়া করিয়া আমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর প্রদান কর।

মহা। দেবি! তুমি রমণীদিগের হিতের জন্য যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ক্রমে ক্রমে সে সমস্তেরই উত্তর প্রদান করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর;———

অষ্টম মাসে গর্ভে বেদনা হইলে, তণ্ডুলোদকের সহিত ধনিয়া বাঁটিয়া খাওয়াইবে। অথবা সুশীতল জলের সহিত পলাশপত্র বাঁটিয়া খাওয়াইবে। ইহাতে শীঘ্র বেদনা দূরীকৃত হয়। রক্তস্রাব নিবারণার্থ কয়েত বেল, বেল, বৃহতী, পটোল, ইক্ষু ও কণ্টকারী, ইহাদিগের মূল সমভাগে দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিতে দিবে। পণ্ডিতগণ নবম, দশম ও একাদশ মাসকেই প্রসবের প্রকৃত সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তদপেক্ষা অধিক বিলম্ব হইলে বিকৃত গর্ভ বলিয়া স্থির করেন। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দশমমাসে যে সন্তান প্রসব হয়, তাহাই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার

পূর্ব্বে সন্তান জন্মিলে, স্পষ্টতঃই হউক বা সূক্ষ্মরূপেই হউক, অবশ্যই তাহার কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের শক্তি হ্রাস হয়। আবার কোন দোষাদির আধিক্যে প্রসবের ব্যাঘাত না জন্মান সত্ত্বেও যদি স্বভাবতঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে বিলম্ব হয়, তাহাহইলে অবশ্যই তাহার কোন না কোন অঙ্গ অধিক বা ইন্দ্রিয় প্রবল হইয়াছে এরূপ দেখা যায়।

নবমমাসে গর্ভে বেদনা হইলে বিশেষরূপে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। প্রকৃত প্রসব-বেদনা হইলে তদনুরূপ কার্য্য করিবে। নতুবা এরণ্ডমূল ও কাকোলী শীতল জলের সহিত, কিম্বা পলাশবীজ, কাকোলী ও ঝাঁটিমূল কাঞ্জিকের সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইবে। রক্তস্রাবে যষ্টিমধু, অনন্তমূল, ক্ষীরকাঁকলা, শ্যামালতা, এই কয়েকটী দ্রব্য জলে বাঁটিয়া সেবন করাইবে। যদি কেহ ভ্রমবশতঃ প্রসব-বেদনায় সময়ই এই সমস্ত যোগ প্রয়োগ করে, তবে তাহাতেও বিশেষ কিছু দোষ হইবে না। কেননা সময় ও অবস্থানুসারে গর্ভের পক্ষে যাহা একান্ত হিতকর, কেবল তাহাই বলিতেছি।

দশমমাসে বেদনা উপস্থিত হইলে নীলোৎপল, যষ্টি-মধু, মুগ ও চিনি দুগ্ধের সহিত ভোজন করাইবে। ইহাতে গর্ভের দোষ ও বেদনা নিবারিত হয়। কখন কখন কোন বিকৃত গর্ভ একাদশ, দ্বাদশ বা ততোধিক কাল অতীত

হইলেও প্রসব হয় না, এরূপ দেখা যায়। তদ্রূপ অবস্থায় একাদশ মাসে গর্ভশূল হইলে যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, মৃণাল ও নীলোৎপল; অথবা ক্ষীরকাঁকলা, উৎপল, কুড়, বরাহক্রান্তামূল ও চিনি শীতল জলে বাঁটিয়া সেবন করিতে দিবে। দ্বাদশ মাসে চিনি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী বাঁটিয়া সেবন করাইবে।

কখন কখন বায়ুদ্বারা গর্ভ বা বালক শুষ্ক হইয়া প্রসবের ব্যাঘাত জন্মায়! তদ্রূপ স্থলে চিনি, যষ্টিমধু ও গাম্ভারী ফলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পানার্থ ব্যবস্থা করিবে। তাহাতে গর্ভ পুষ্ট হয়।

আবার অকালে গর্ভপাতের লক্ষণ উপস্থিত হইলে, কেশুর, পানিফল, জীবনীয়গণ (অর্থাৎ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, মুগানী, মাষানী, জীবন্তী, যষ্টিমধু) পদ্মকেশর, উৎপল, এরণ্ডমূল ও শতমূলী, এই সমুদায়ের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ চিনির সহিত পান করাইবে। তাহাতে গর্ভস্রাব নিবারণ হয়।

ছাগদুগ্ধ।০ পোয়া, মধু ২ মাষা, কুম্ভকারমর্দ্দিত হণ্ডিকাস্থ মৃত্তিকা ৪ মাষা একত্রিত করিয়া পান করাইলে গর্ভপাত নিবারণ হয়।

গর্ভস্রাবের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে কেশুর, পানিফল, পদ্মকেশর, উৎপল, মুগানী, যষ্টিমধু ও চিনি, দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে। এবং দুগ্ধ ও অন্ন পথ্য দিবে।

তাহাতেই গর্ভ প্রকৃতিস্থ হইবার সম্ভাবনা। নতুবা গর্ভ-বিলাস তৈল মর্দ্দন করিবে। তাহাতে গর্ভশূল ও রক্ত-স্রাবাদি নিবারণ হইয়া পতনোন্মুখ গর্ভও স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়।

গর্ভবিলাস তৈল।—মূর্চ্ছিত তিল তৈল /৪ সের। কল্কার্থ ভূমিকুষ্মাণ্ড, দাড়িম্বপত্র, কাঁচা হরিদ্রা, ত্রিফলা, পানিফলপত্র, জাতীপুষ্প, শতমূলী, নীলোৎপল, পদ্মপুষ্প মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাকশেষ করিয়া প্রয়োগ করিবে।*

বিদারী দাড়িমংপত্রং রজনীচ ফলত্রয়ম্।
শৃঙ্গাটকস্য পত্রঞ্চ জাতীকুসুম মেবচ॥
বরী নীলোৎপলং পদ্মং তৈলমেতেঃ পচেৎ সুধীঃ।
এতদ্‌গর্ভবিলাসাখ্যং গর্ভসংস্থাপনং পরম্॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন, জীবিতনাথ! এইত গর্ভের সাধারণ লক্ষণ ও তাহার আনুষঙ্গিক কয়েকটী রোগের কথা শুনিলাম। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন ব্যারাম হইলে কি উপায়ে তাহার প্রতীকার করিতে হয়? তাহাও বিশেষ করিয়া শুনিতে ইচ্ছা করি।

মহাদেব কহিলেন, প্রিয়ে! সংসারে যত প্রকার রোগ আছে, তৎসমস্তই গর্ভাবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে। সেই সকলের বিশেষ কোন বিবরণ বলিবার প্রয়োজন নাই। অবস্থা দৃষ্টে যাহা গর্ভের পক্ষে হিতকর অথচ রোগ-প্রশমক বলিয়া বোধ হইবে, তাহাই বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ কবিবে। কিন্তু আবার এমন কতকগুলি রোগ আছে যে, শীঘ্র শীঘ্র তাহার প্রতীকার না করিলে গর্ভিণীর জীবন শঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহাই বলিতেছি। গর্ভিণীর রোগ হইলে যদি ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, তবে স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কখনও সাধারণ বিধান অনুসারে চিকিৎসা করিবে না। অথবা কোন প্রকার তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধও সেবন করিতে দিবে না। তাহা হইলে গর্ভিণী ও গর্ভস্থ

সন্তান উভয়েরই ভাবী অনিষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা। গর্ভাবস্থায় জ্বর হইলে প্রথমতঃ—

মুথা, বেণার মূল, ক্ষেতপাঁপড়া, রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ, প্রত্যেকটী ।/২ পাঁচ আনা দুই রতি করিয়া একত্রে শিলায় ছেঁচিয়া লইবে। এবং চারি সের জলে পাক করিয়া দুই সের থাকিতে নামাইয়া রাখিবে। অত্যন্ত পিপাসা হইলে এই জল ছাকিয়া পান করাইবে। ইহাতে শীঘ্র পিপাসার শান্তি, দোষের লাঘব এবং জ্বরের বেগ হ্রাস হইয়া থাকে।

রক্তচন্দন, অনন্তমূল, লোধ, দ্রাক্ষা, এই সমুদায়ের ক্বাথ চিনির সহিত পান করাইলে গর্ভিণীর জ্বর শান্তি হয়,

এরণ্ডমূল, গুলঞ্চ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, দেবদারু ও পদ্মকাষ্ঠ, এই সমুদায়ের ক্বাথ পান করিলে গর্ভিণীর জ্বর নিবারণ হয়।

বাসকছাল, গুলঞ্চ, কণ্টকারী মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল /॥০ সের, শেষ অর্দ্ধপোয়া, প্রক্ষেপ মধু। এই কষায় পান করিলে গর্ভিণীর শোথ, শ্বাস, কাস, জ্বর ও বমি নিবারণ হয়।

শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই কয়েকটী দ্রব্যের ক্বাথ মধুর সহিত অথবা এই কয়েকটী দ্রব্য দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে গর্ভিণীর জ্বর শান্তি হয়।

গর্ভচিন্তামণি রস।—শোধিত পারদ, গন্ধক, হরিতাল, জারিত লৌহ প্রত্যেকে ২ তোলা, জারিত অভ্র ৪ তোলা, কর্পূর, রঙ্গভস্ম, তাম্রভস্ম, জায়ফল, জয়িত্রী, গোক্ষুরবীজ, শতমূলী, বেড়েলা ও শ্বেতবেড়েলামূল প্রত্যেকে ১ তোলা। এই সমুদায় উত্তমরূপে জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে গর্ভবতী স্ত্রীর জ্বর ও দাহ এবং প্রদর প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। এই ঔষধে কেহ কেহ কজ্জলীর (পারদ গন্ধকের) পরিবর্ত্তে রসসিন্দুরও ব্যবহার করিয়া থাকেন।*

গর্ভবিলাস রস।—শোধিত পারদ, গন্ধক এবং তুতিয়া, সমভাগে গোঁড়ালেবুর রসে তিন দিন মর্দ্দন করিয়া ত্রিকটুর ক্বাথে তিন বার ভাবনা দিবে এবং ২ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। দোষানুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিয়া জ্বরের তরুণ অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।†

---

* রসং তালং তথা লোহং প্রত্যেকং কর্ষমাত্রকম্।
কর্ষদ্বয়ং তথাচাভ্রং কর্পূরং বঙ্গং তাম্রকম্॥
জাতীফলং তথা কোষং গোক্ষুরঞ্চ শতাবরী।
বলাতিবলয়োর্মূলং প্রত্যেকং তোলকং শুভম্॥
বারিণা বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জা ফলমানতঃ।

† রসগন্ধক তুথঞ্চ ত্র্যহং জম্বিরমর্দ্দিতং।
ত্রিভাবিতং ত্রিকটুনা দেয়ং গুঞ্জাদ্বয়োন্মিতম॥

ইন্দুশেখর রস।—শিলাজতু, অভ্র, রসসিন্দুর, প্রবাল, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক ও হরিতাল প্রত্যেক সমভাগ একত্রে মর্দ্দন করিয়া ভৃঙ্গরাজ, অর্জ্জুনছাল, নিসিন্দা, বাসক, স্থলপদ্ম, পদ্ম ও কুড়চিছালের রসে ভাবনা দিয়া মটর-প্রমাণ বটীকা করিবে। এবং দোষানুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে গর্ভিণীর জ্বর, শ্বাস, কাস, শিরঃপীড়া, রক্তাতীসার, গ্রহণী, বমন, ক্ষুধামান্দ্য, আলস্য ও দৌর্ব্বল্য নিরাকৃত হয়।*

বালা, শোনাছাল, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনিয়া, গুলঞ্চ, মুথা, বেণারমূল, দুবালভা, ক্ষেতপাঁপড়া,, আত-ইচ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে নানাপ্রকার অতীসার, রক্তস্রাব ও সূতিকারোগ নষ্ট হয়।

আমছাল ও জামছালের ক্বাথ খইচূর্ণের সহিত সেবন করিলে গর্ভিণীর গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়।

লবঙ্গ, সোহাগার খই, মুথা, ধাইকুল, বেলশুঁঠ, ধনিয়া, জায়ফল, শ্বেতধুনা, শুল্‌ফা, দাড়িমফলের ছাল,

---

* শিলাজত্বভ্র সিন্দুর প্রবালায়ো রজাংসি চ।
মাক্ষিকঞ্চ তথা তালং সমভাগানি মর্দ্দয়েৎ॥
ভৃঙ্গরাজস্য পার্থস্য নিগুণ্ড্যা বাসকস্য চ।
স্থলপদ্মস্য পদ্মস্য কুটজস্য চ বারিণা॥
ভাবয়িত্বা বটীঃ কৃত্বা কলায় পরিমাণতঃ।
যথা দোষানুপানেন গর্ভিণীষু প্রয়োজয়েৎ॥

জীরা, সৈন্ধব, মোচরস, নীল সুদীমূল, রসোত, জারিত অভ্র ও রঙ্গ, বরাক্রান্ত, রক্তচন্দন, শুঁঠ, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, খদির এবং কলা, উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহাকে লবঙ্গাদি চূর্ণ কহে। এই ঔষধ কিঞ্চিৎ ছাগদুগ্ধের সহিত গর্ভাবস্থায় সেবন করাইলে সংগ্রহ গ্রহণী, অতীসার ও আমরক্তাদি পীড়া শীঘ্র প্রশমিত হয়।

আবার আরও কতকগুলি পীড়া সহসা গর্ভবস্থায় প্রবল হইয়া গর্ভিণীকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়া থাকে। সেই সকল পীড়ার জন্য বিশেষ কোনও চেষ্টা করিতে হয় না। সন্তান প্রসব হইলে আপনা হইতেই তাহা উপশমিত হইয়া থাকে।

পার্ব্ব। প্রভো! কি প্রকার আচার ব্যবহার গর্ভের পক্ষে একান্ত হিতকর?

মহা। প্রিয়ে! এক্ষণে গর্ভিণীর কৃত্যাকৃত্য সম্বন্ধে যথোচিত বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। গর্ভের প্রথম দিবস হইতে স্ত্রীলোক উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্তে থাকিবে এবং একান্ত শুদ্ধাচারিণী হইয়া দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণের সেবায় সর্ব্বদা অবহিত থাকিবে। সুমিষ্ট, স্নিগ্ধ, হৃদ্য, দ্রব, সুসংস্কৃত ও সুখ-পাচ্য দ্রব্য সকল আহার করিবে। ব্যায়াম বা অপকৃষ্ট বিষয়ে অধিক আনন্দ অনুভব করিবে না। পুরুষ-সংসর্গ

বা অতিরিক্ত আমোদ, রাত্রিজাগরণ, শোক, যানারোহণ, রক্তমোক্ষণ, বেগরোধ এবং উৎকট আসন পরিত্যাগ করিবে। এমন কি অষ্টম মাসে যে গর্ভিণী পুরুষাভিলাষিণী হইয়া মৈথুনাদি কার্য্যে ব্যাপৃতা হয়, তাহার গর্ভনাশ এবং মৃত্যু পর্য্যন্তও হইতে পারে। অথবা নিতান্তপক্ষে অন্ধ, মূক, বধির, বা কুব্জ, সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। গর্ভবতী নারী বিকৃতাকার, মলিন বা হানাঙ্গী স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিবে না। দুর্গন্ধ আঘ্রাণ, অপ্রীতিকর বস্তু দর্শন, উদ্বর্ত্তন বা অঙ্গে অধিক তৈল মর্দ্দন করিবে না। শুষ্ক পচা বা অপক্ক অন্ন আহার পরিত্যাগ করিবে। কখনও উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবে না বা যাহাতে গর্ভনাশ হয়, এরূপ কোন কার্য্য করিবে না। চৈত্য, শ্মশান বৃক্ষ, অযশস্কর ভাব, বহির্নিষ্ক্রমণ, ক্রোধ ও শূন্যাগার বর্জ্জন করিবে। মৃত্তিকাতে শয়ন বা উপবেশন সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে।

পার্ব্বতী। হে দেবাদিদেব মহাদেব! এই ক্ষণ আরও একটী বিষয় শুনিবার জন্য আমার মন নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছে। কি প্রকারে জীবগণ গর্ভমধ্যে জীবন ধারণ করে? এবং কি খাইয়াই বা তাহারা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া যথাসময় ভূমিষ্ঠ হয়?

মহা। প্রিয়ে! এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যাহা কিছু দেখিবে, তৎসমস্তই আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

আমিই পঞ্চ মহাভূতে বিভক্ত হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছি। সেই মহাভূত সকলের বিকার এবং চেতনা নামক ষষ্ঠ ধাতুর সমবায়ে জরায়ুরূপ আকাশমধ্যে গর্ভের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অগ্নি, সোম, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সত্ত্ব, রজঃ, তম, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও ভূতাত্মা, এই কয়েকটা গর্ভের জীবনী-শক্তি-দায়ক। অগ্নি পাচন, ভ্রাজন, প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা গর্ভস্থ বালককে জীবিত রাখে। সোম ওজঃ প্রভৃতি সৌম্য ধাতুর পোষণ এবং বায়ু ও অগ্নি দ্বারা যে ভাগ শুষ্ক হয়, সেই ভাগকে আদ্রকরতঃ গর্ভস্থ বালককে জীবিত রাখে। মৃত্তিকা শরীরস্থ জলক্লিন্নভাগকে অপেক্ষাকৃত কঠিন করিয়া; বায়ু নিশ্বাস প্রশ্বাস, দোষ, ধাতু ও মলাদির সঞ্চালন করিয়া, আকাশ বায়ু ও অগ্নি দ্বারা বিদারিত স্রোতসকলকে উদ্ধ অধঃ ও তার্য্যক্ গমনে অবকাশ প্রদান করিয়া গর্ভস্থ বালককে জীবিত রাখে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণাত্মক মন জীবাত্মার শরীরান্তর গ্রহণ ও মোক্ষণের কারণ বলিয়া গর্ভস্থ বালক জীবিত থাকে। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয় দর্শন স্পর্শনাদি কর্ম্ম দ্বারা জীবন রক্ষা করে; এবং কর্ম্ম পুরুষ ভূতাত্মা অশেষ কর্ম্মরাশির চৈতন্যস্বরূপ দেহে অবস্থান করিয়া দেহীর জীবন রক্ষা করে। আবার গর্ভস্থ সন্তানের নাভির সহিত জননীর রস-বহা নাড়ী সংযুক্ত থাকে। তদ্দ্বারা সন্তান

জননীর আহার রসাদি আকর্ষণ করিয়া দিন দিন নিজ দেহ বর্দ্ধিত করে এবং জননীর নিশ্বাস প্রশ্বাস সঞ্চালন ও নিদ্রা অনুসারে সন্তানেরও নিশ্বাস প্রশ্বাস সঞ্চালন ও নিদ্রা হইয়া থাকে। আরও গর্ভস্থ শিশুর নাভিমধ্যে স্থির জ্যোতিঃস্থান আছে, তথায় সর্ব্বদা বায়ু ধমন করে। সেই ধমিত বায়ু উষ্ণতাসহকারে স্রোতঃ পথে শরীরের ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তীর্য্যক্ ভাগে গমন করিয়া গর্ভস্থ সন্তানের দেহ বৃদ্ধি করে।

পার্ব্বি। তবে নাথ! জননীর আহারাদি দ্বারা যখন গর্ভস্থ সন্তানেরও আহার কার্য্য সম্পন্ন হয়, তবে কেনই বা উক্ত সন্তান গর্ভমধ্যে মলমূত্র ত্যাগ না করে? আর উদরে সামান্য শব্দ হইলেও যখন তাহা বাহির হইতে অনায়াসে শুনিতে পাওয়া যায়, তখন গর্ভস্থ সজীব সন্তানের ক্রন্দন বা অন্য কোন প্রকার শব্দ কেনই বা বাহির হইতে না শুনা যায়? তাহারা কি ক্রন্দন করে না?

মহা। দেবি! আহার করিলে অবশ্যই মলমূত্র ত্যাগ করিতে হয়, তাহা সত্য, কিন্তু গর্ভস্থ বালক ত তদ্রূপ কিছুই আহার করে না। বিশেষতঃ তাহাদের বাতাদির পরিমাণ অতি অল্প এবং বায়ু ও পক্কাশয় পরস্পর ঈষৎ সংযুক্ত থাকে, তজ্জন্যই তাহারা কখনও মলমূত্র ত্যাগ করিতে পারে না। আবার তাহাদিগের

মুখমণ্ডল জরায়ু কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন, কণ্ঠ কফ দ্বারা বেষ্টিত এবং বায়ুর পথ অবরুদ্ধ থাকে, তজ্জন্যই তাহারা কখন রোদন বা অন্য শব্দ করিতে পারে না।

তৃতীয় অধ্যায়।

পার্ব্বতী। হে আশুতোষ! গর্ভরক্ষা ও গর্ভিণীর কৃত্যাকৃত্য বিষয় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে যে উপায় অবলম্বন করিলে সুখে প্রসব হয় এবং প্রসূত সন্তানের মঙ্গল বিধান হয়, তাহাই বিশেষ রূপ বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে আশু পরিতোষ কর।

মহা। দেবি! এরূপ না হইলে আর তুমি ত্রিলোকজননী বলিয়া অভিহিতা হইবে কেন? জগতের হিতের জন্য—একমাত্র প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, ক্রমে সে সকলেরই উত্তর প্রদান করিতেছি। প্রথমতঃ সূতিকাঘরের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক। যে ঘরে সকলে সর্ব্বদা বাস করে, সেই ঘরে কখনও প্রসব হইতে দিবে না। ঘর খানি অত্যন্ত বড় বা একবারে ছোটও করিবে না। সাধারণতঃ আট হাত দীর্ঘ ও চারি হাত প্রশস্ত হইলেই যথেষ্ট হইবে। বাটীর মধ্যস্থিত কোন প্রশস্ত স্থানে শুভ লগ্নে উপযুক্ত সময়ে পূর্ব্ব বা উত্তর দ্বারী করিয়া সূতিকা ঘর খানি প্রস্তুত রাখিবে।

পার্ব্ব। কেন প্রভু, বাস-গৃহে সন্তান প্রসব হইলে কি তাহাতে কোন দোষ আছে?

মহা। তা না থাকিলে আর এরূপ বলিব কেন? যে ঘরে লোক সর্ব্বদা বাস করে, সেই ঘর খানি অত্যন্ত পবিত্র থাকা চাই—

পার্ব্ব। তবে কি নাথ! সন্তান এমনই তুচ্ছ হইল যে, সে যে ঘরে জন্মগ্রহণ করিবে, সে ঘর খানিও অপবিত্র হইবে!

মহা। না প্রিয়ে! সন্তান এমন তুচ্ছ নয়; কিন্তু তাই বলিয়া প্রসবের সময় অপত্যপথ হইতে যে সকল ক্লেদোময় পদার্থ নির্গত হয় বা প্রসূতি যে সকল মল-মূত্রাদি ত্যাগ করে, তাহাও কি পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে? সেই সকল ক্লেদভাগ মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত থাকিয়া তত্রত্য বায়ুরাশি কি দূষিত করিয়া ফেলে না? সেই ঘরে যে বাস করিবে, তাহাতে কি তাহার সম্পূর্ণ বা আংশিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবে না! আজ তুমি এরূপ বলিতেছ কেন? ম্লেচ্ছ ও কিরাত প্রভৃতি জঘন্য জাতিগণ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে; যাহা-দের আচারবিচার, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম জ্ঞান নাই, যাহারা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কিছুমাত্র জ্ঞাত না হইয়া দিবারাত্রি কেবল বিজ্ঞান বিজ্ঞান করিয়া একবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা এই সকল কার্য্যকে ততদূর দোষাবহ

বলিয়া মনে করিতে না পারে; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী বিচক্ষণ লোকের পক্ষে ইহার অন্যথা করা কোন মতেই যুক্তি-সঙ্গত নহে। এমন কি, অশৌচান্তে প্রসূতি যখন সূতিকা-ঘর হইতে বাহির হইবে, তখন ঐ ঘর দূরে নিক্ষেপ করিয়া সেই স্থানখানি উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া দিবে। পাছে প্রসূতির শরীরেও কোন প্রকার দুর্গন্ধ থাকে, এই আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ নখাদি ছেদন ও উত্তমরূপ গাত্রাদি মার্জ্জন করিয়া স্নান করিয়া আসিবে।

পার্ব্ব। ভাল, তাহাই যেন হইল, কিন্তু পূর্ব্ব বা উত্তর দ্বারী করিয়া ঘরখানি প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন কি? অন্য দিক্ দুয়ার রাখিলে কি কোন ক্ষতি আছে?

মহা। কোন ক্ষতি না থাকিলে আর একথা বলিব কেন? আমি যাহা বলিতেছি বা যাহা পরে বলিব, তাহার একটী কথাও অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিও না। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, ইহার প্রত্যেক কথাতেই বিজ্ঞান-শাস্ত্রের যুক্তি-পরম্পরা জাজ্জ্বল্যমান প্রকাশ পাইতেছে। একবার মনে করিয়া দেখ, সংসারে তেজভিন্ন কিছুই রক্ষা পায় না। তেজঃ দ্বারাই পরমাণু সমূহ পরস্পর দৃঢ়রূপে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, আবার সেই তেজঃ দ্বারাই তাহারা বিয়োজিত হইয়া নিত্য নূতন কত প্রকার অত্যদ্ভুত রচনা-কৌশল প্রদর্শন করিতেছে। তেজেই দেহীর দেহ রক্ষা

হয়। আবার সেই তেজে বা তেজাভাবেই দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়। সন্তান যতদিন পর্য্যন্ত মাতৃগর্ভে শয়ান থাকে, ততদিন কেবল জননীর তেজেই তেজীয়ান হইয়া আপনার দেহ বর্দ্ধিত করে। সহসা সেই তেজ হইতে স্খলিত হইয়া যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়—যখন পাপ-তাপ-পূর্ণ সুখ-দুঃখ-ভরা শীতোষ্ণ সংসার-সাগরে ঝম্প প্রদান করে, তখন কি তাহার অন্য তেজের প্রয়োজন হয় না? আবাব দিবাভাগ অপেক্ষা রাত্রিতে স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ শীতের পরিমাণ অধিক হইয়া থাকে। সুতরাং শীতাধিক্যবশতঃ রাত্রিতে প্রসূত সন্তানেরও তেজের অল্পতা হইয়া পড়ে। যাহাতে সেই অভাব শীঘ্র শীঘ্র পূর্ণ হয়, তদনুযায়ী কার্য্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ভগবান্ মার্ত্তণ্ড-দেবের শরীর হইতে যে পরিমাণ তাড়িৎ প্রবাহিত হয়, তত আর কিছু হইতেই নয়। প্রসূত সন্তান সেই তাড়িৎ দ্বারা প্রাতঃকালে নিজের অভাব পূরণ করিবে বলিয়াই সূতিকা ঘরখানি পূর্ব্ব দ্বারী করিয়া প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, বায়ু একটী যৌগিক পদার্থ। ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহার উপকরণ-সমষ্টির পরিমাণ সকল সময় সমান থাকে না। তাই এক এক দিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ুর গুণও এক এক রূপ হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্ব বা উত্তরদিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাই প্রসূতি ও প্রসূত সন্তানের

পক্ষে একান্ত হিতকর। তজ্জন্যই সূতিকা ঘরখানি পূর্ব্ব বা উত্তর দ্বারী করিয়া প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। আবার ঋতুবিশেষে অর্থাৎ বর্ষাকাল প্রভৃতিতে যখন পূর্ব্বদিকের বায়ু স্বভাবতঃই কিঞ্চিৎ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে, সেই সময় কুঁড়ে ঘরের দুয়ার উত্তর দিকে করাই প্রশস্ত। এতৎসম্বন্ধে আরও অনেক যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে প্রস্তাবটী ক্রমেই বাড়িয়া যায় যাঁহারা বিজ্ঞ লোক, তাঁহারা আপনা হইতেই সেই সমস্ত যুক্তি ও কারণ অনুসন্ধান করিয়া লইবেন।

যথানিয়মে সূতিকা ঘর প্রস্তুত হইলে, প্রসূতির মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিবার জন্য স্বতন্ত্র একটী স্থান নির্ম্মাণ করিবে। তাহা সূতিকা ঘরের সংলগ্ন বা যথাসম্ভব নিকটবর্ত্তী হওয়া আবশ্যক। যাহাতে ঐ পরিত্যক্ত মলমূত্রাদির দুর্গন্ধ সূতিকা ঘরে প্রবেশ করিতে না পারে, এমন কোন বন্দোবস্ত করা নিতান্ত আবশ্যক। অনন্তর প্রসবের সময় বা পরে যাহা যাহা প্রয়োজন হইবে, তাহা পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। ঘরে আবশ্যকমত অগ্নিকুণ্ড করিবার জন্য তিন্দুক বা ইঙ্গুদী কাষ্ঠ প্রস্তুত করিয়া রাখিবে।

পার্ব্ব। কেন নাথ! অপ্রশস্ত সূতিকা ঘরে সর্ব্বদা অগ্নি জ্বালিয়া ঘরখানিকে উত্তপ্ত এবং প্রসূত সন্তানকে একবারে ভাজা ভাজা করিবার প্রয়োজন কি? আঃ

নিতান্ত পক্ষে যদি তাহাই কর্ত্তব্য হয়, তবে অন্য কাষ্ঠের ইন্ধনেই বা দোষ কি ?

মহা। প্রিয়ে! পূর্ব্বেই ত কহিয়াছি, একমাত্র তাপই পার্থিব কার্য্যের প্রধান উপকরণ। মাতৃদেহ-সম্ভূত উত্তাপ হইতে সহসা বিচ্যুত হওয়ায়, জরায়ু-মধ্যস্থিত উত্তপ্ত বায়ুমণ্ডলী হইতে পার্থিব শীতল বায়ুর সহিত সহসা সংযুক্ত হওয়ায়, প্রসূত সন্তানের যারপরনাই বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। কেবলমাত্র সেই সকল বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার জন্যই সূতিকাঘরে সর্ব্বদা অগ্নি রাখিবার প্রয়োজন। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, একটী দেহ হইতে অন্য একটী দেহ বাহির হইলে, সেই দেহ কতদূর প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে। দশমাস পর্য্যন্ত অসহ্য গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করিয়া গর্ভিণীর দৈহিক কার্য্যের অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। আবার প্রসব-সময় যে সকল অদ্ভুত অমানুষিক কাণ্ড কারখানা সম্পন্ন হইয়া যায়, তাহাতে প্রসূতির একপ্রকার নবজীবন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই সময় গর্ভস্থ সন্তান যে প্রকার ঘূর্ণিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাতে প্রসূতির অস্থি, মাংস, শিরা, ধমনী প্রভৃতি একবারে শিথিল হইয়া যায়। এমন কি, তখন তাহার ইন্দ্রিয়াদিও অনেকাংশে ভাবান্তরিত হইয়া উঠে। সুতরাং সেই সময় যাহাতে প্রসূতির কোন প্রকার পীড়া জন্মিতে না পারে, এবং শীঘ্র শীঘ্র তাহার শরীর আবার প্রকৃতিস্থ

হইয়া উঠে, তদ্রূপ কার্য্য করা ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। অতিরিক্ত শৈত্য সেবা করিলে সেই সকল বিপদ হইতে কিছুতেই মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় না। তজ্জন্যই সূতিকাঘরে অগ্নি-কুণ্ড করিয়া আবশ্যকমত প্রসূতি ও প্রসূত সন্তানকে সময় সময় স্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। উক্ত সন্তানকে ভাজা ভাজা করিবার অভিপ্রায়ে ঘরে আগুণ রাখিতে হয় না। তদ্দ্বারা অপকার অপেক্ষা উপকারের সম্ভাবনাই অধিক। আবার দেখ, পাছে ধুঁয়াদ্বারা সন্তান ও প্রসূতির কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটে, এই আশঙ্কায় তিন্দুক ও ইঙ্গুদীকাষ্ঠের দ্বারা আগুণ রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ কাষ্ঠ আগুণের উপর ধরিলে অপেক্ষাকৃত সুগন্ধ বিস্তৃত হয়। চক্ষে, মুখে মুহুর্মুহুঃ ধুঁয়া লাগিলেও তাহাতে অধিক কষ্ট বোধ হয় না। উহা মঙ্গলজনক এবং গ্রহদোষ-নিবারক। নিতান্ত পক্ষে ঐ কাষ্ঠ না পাওয়া গেলে অন্য কাষ্ঠ দ্বারাও কার্য্যোদ্ধার হয়, কিন্তু ধুঁয়া নির্গমনের অন্য কোন প্রশস্ত উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। অনন্তর প্রয়োজনীয় ভেষজ দ্রব্যাদিও যথাসময়ে সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। নতুবা সময়কালে সেই সকল বস্তুর অপ্রাপ্তিতে নানাপ্রকার অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে। এইক্ষণ সেই সমুদায়ের নামোল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যথাসময় ক্রমে ক্রমে তাহা বলিব।

সমুদায় আয়োজন শেষ হইলে গর্ভিণী হৃষ্টচিত্তে প্রসবকালের জন্য অপেক্ষা করিবে। প্রসবের কাল আসন্ন জানিয়া তাহাকে তৈল মাখাইয়া উষ্ণজলে স্নান করাইবে এবং ঈষদুষ্ণ যবাগূ (যবেব মণ্ড) ঘৃতের সহিত যথাপরিমাণ সেবন করাইবে। অনন্তর সূতিকা-ঘরে উপাধানযুক্ত সুকোমল শয্যা প্রস্তুত করিয়া ব্যথান্বিতা নারীকে আস্তে আস্তে তদুপরি শয়ন করাইবে এবং ঐ ব্যথান্বিতা নারীও আপনার উরুদ্বয় সংকুচিতভাবে রাখিয়া উর্দ্ধমুখে অবস্থান করিবে। এই সময় প্রসব-কুশলা চারিটী জনয়িত্রী নখাদি উত্তমরূপে ছেদন করিয়া আসন্ন-প্রসবার পরিচর্য্যা করিতে নিযুক্তা হইবে। যাহারা নিজে অনেকবার সন্তান প্রসব করিয়াছে, যাহারা প্রসব-কার্য্যে অত্যন্ত চতুরা এবং বুদ্ধিমতী, যাহারা প্রসবসম্বন্ধে যাবতীয় উপদ্রব নিবারণ করিতে সক্ষম এবং মিষ্টভাষিণী, তাহাদিগকেই এই কার্য্যে বরণ করিবে। নতুবা যাহারা কেবল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বা গুরুর নিকট উপদেশমাত্র লইয়া ধাত্রী-পদে নিযুক্তা হইতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে কখনও আসন্ন-প্রসবার পরিচর্য্যা করিতে দিবে না। যখন দেখিবে, গর্ভিণীর কুক্ষি শিথিল, হৃদয়-বন্ধন মুক্ত, জঘন বেদনাযুক্ত, কটি এবং পৃষ্ঠদেশ ব্যথিত এবং মুহুর্মুহুঃ মূত্র ও মলত্যাগে প্রবৃত্তি হইতেছে, তখনই প্রসবের কাল আসন্ন জানিবে।

এই কথা শুনিয়া পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! প্রসবের সময় গর্ভিণী কিজন্য মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করে?

মহাদেব কহিলেন, ভগবতি! সকলের সম্বন্ধে তাহা নয়। বাতাদি দোষকুপিত থাকায় পূর্ব্বে যাহাদের রীতিমত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, তাহারাই প্রসবের সময় মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কার্য্যদক্ষ সুচতুরা ধাত্রীগণ তাহাতে কিছুমাত্র ঘৃণা প্রকাশ করিবে না। কেবল হৃষ্টচিত্তে মিষ্টবাক্যে আসন্ন-প্রসবার সন্তোষ-বিধান করাই তাহাদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য।

যখন দেখিবে, মুহুর্মুহুঃ বেদনায় গর্ভিণী একবারে অস্থিরা হইয়া পড়িতেছে এবং সন্তানও হৃদয়-বন্ধন-মুক্ত হইয়া ঊর্দ্ধপদে হেটমুণ্ডে ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়াছে, তখন বুদ্ধিমতী মিষ্ট-ভাষিণী জনৈক জনয়িত্রী প্রসূতির অপত্য-পথের চতুর্দ্দিকে তৈল মাখাইয়া কহিবে—"সুভগে! প্রবাহণ কর (কুন্থন দাও), যদি ব্যথা হইয়া থাকে, তবে প্রবাহণ কর, ব্যথা না হইলে প্রবাহণ করিও না।" কেননা ব্যথা-রহিতা প্রসবিণী প্রবাহণ করিলে সন্তানের নানা প্রকার বৈগুণ্য জন্মে' তাহাতে মূক, বধির, কুব্জ, শ্বাস কাশ, প্লীহা ও ক্ষয় রোগগ্রস্ত সন্তান জন্মিতে পারে।

এই সময় আর একজন পরিচারিকা প্রসূতিকে বেশ কায়দা'মত বসাইয়া তাহার মস্তক আপনার স্কন্ধোপরি

সংস্থাপন করিবে এবং আস্তে আস্তে তাহার কর্ণে এই মন্ত্র জপ করিবে। যথা—

"ক্ষিতির্জ্জলং বিয়ত্তেজো বায়ুর্ব্বিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ।
সগর্ভাং তাং সদা পান্তু বৈশল্যং চ দিশন্তুতে॥
প্রসূবস্ব মাবক্লিষ্ট মবিক্লিষ্টা শুভাননে।
কার্ত্তিকেয় দ্যুতিং পুত্রং কার্ত্তিকেয়াভিবক্ষিতম্॥"

এই সময় অন্যান্য স্ত্রীগণ কেবল গর্ভিণীকে হিতোপদেশ প্রদান করিবে। আর কহিবে—"প্রথমে ধীরে ধীরে কুন্থন দিয়া পরে গর্ভ-যোনি-মুখে সমাগত হইলে বলপূর্ব্বক কুন্থন দাও।" গর্ভিণী তদনুযায়ী কার্য্য করিলে নিকটবর্ত্তী স্ত্রীগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিবে "হয়েছে!!! হয়েছে!!! বেশ হয়েছে!!! অতি উত্তম ছেলে হয়েছে!!! ইত্যাদি।" কেননা এই সকল কথা শুনিলে গর্ভিণীর প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে। সুতরাং প্রসব-যন্ত্রণাও অনেক লাঘব হয়।

অনন্তর অম্বিকা কহিলেন, নাথ! আজ তোমার মুখে প্রসবের কথা যেরূপ শুনিলাম, সকল সময় ত এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। কখন কখন এমনও দেখা যায় যে, তিন চারি বা ততোধিক দিন অতীত হইলেও সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না। তখন সন্তানের মঙ্গল-কামনা দূরে থাক্, প্রসূতির প্রাণ লইয়াই যার পর নাই ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এরূপ হইবার কারণ কি? এবং

তাহা হইলে কি উপায় অবলম্বন করিলেই বা প্রসূতি ও প্রসূত সন্তানের মঙ্গল-বিধান হয়?

এই কথা শুনিয়া পরম কারুণিক মঙ্গলময় মহাদেব কহিলেন, প্রিয়ে! যে সকল রমণী নিতান্ত মুখরা বা চঞ্চলা, যাহারা কখনও দেবদ্বিজের প্রতি যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা করে না, কখনও গুরুজনের সম্মান রক্ষা করে না, সর্ব্বদা কর্কশ-বাক্যে আত্মীয় স্বজনকে জ্বালাতন করে, এক দিনও প্রতিবাসীদিগের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ না করিয়া জল গ্রহণ করে না, তাহারাই প্রসব-সময় যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। সেই সকল দুষ্টা রমণীগণ আপনাদিগের অমূল্য ধন বিনয় ও লজ্জাশীলতার বিষয় স্বপ্নেও একবার চিন্তা করে না; কেবল স্বভাবসিদ্ধ চাপল্যবশতঃ সর্ব্বদা অন্যায়রূপ আহার বিহার করিয়া থাকে। সেই মিথ্যা আহার বিহার দ্বারা গর্ভস্থ সন্তান বিকৃতভাবে অবস্থিতি করিয়া প্রসবের ব্যাঘাত জন্মায়। আবার কোন কারণে গর্ভিণী ভয়প্রাপ্ত হইলেও কখনও নিরাপদে প্রসব করিতে পারে না। তাদৃশ অবস্থায় গর্ভিণী ও গর্ভস্থ সন্তান, এই উভয়েরই মঙ্গলের সম্ভাবনা অতি অল্প। সময় সময় এরূপও দেখা যায়, যাহারা একমাত্র আলস্য-পরতন্ত্র হইয়া সর্ব্বদা বসিয়া বা শুইয়া থাকে, প্রসবের সময় তাহাদিগকেও অত্যন্ত কষ্ট পাইতে

হয়। কিন্তু এইরূপ ঘটনা ধনী লোকের মধ্যেই অধিক হইয়া থাকে। শারীরিক পরিশ্রমের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। প্রথমবারে সন্তান প্রসব করিতে প্রসবিণী যত কষ্ট পায়, আর কোন বারে তত নয়। সন্তান যমজ হইলেও প্রসূতিকে কিঞ্চিৎ অধিক কষ্ট পাইতে হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে অপত্য-পথ হইতে সকলেরই এক প্রকার ক্লেদময় তরল পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকগণ সাধারণতঃ তাহাকে পাণিঠুসী কহে। হৃদয়-বন্ধন মুক্ত হইয়া প্রসবের জন্য সন্তান অতিমাত্র ব্যগ্র হইলে যদি এই পাণি-ঠুসী ভাঙ্গে, তাহা হইলে আর প্রসূতিকে অধিক কষ্ট পাইতে হয় না। কিন্তু যদি অধিক পূর্ব্ব হইতেই পাণি-ঠুসী ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়, তবে নিশ্চয় জানিবে যে প্রসূতির প্রসব-যন্ত্রণাও অনিবার্য্য। যে কারণেই হউক, সন্তান সহজে ভূমিষ্ঠ না হইলে ক্রমে ক্রমে প্রসূতির জীবন সংশয় হইয়া পড়ে। তখন নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকার করিতে যত্ন করিবে।

ইতিপূর্ব্বে যে সকল বস্তু সংগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্য বলা হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে কুড়, এলাচি, লাঙ্গলিক, বচ, চিতা এবং নাটাকরঞ্জ এই সমুদায় দ্রব্য একত্রে চূর্ণ করিয়া গর্ভিণীকে মুহুর্মুহুঃ তাহার গন্ধ

প্রদান করিবে। মধ্যে মধ্যে ভূর্জ্জপত্র বা সিংসপা-সারের ধূম দেওয়াইবে।

পরিশেষে একজন কার্য্যকুশলা জনয়িত্রী, গর্ভিণীর পেটে হাত বুলাইয়া বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, সন্তান কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। যদি প্রকৃতিস্থই থাকে এবং কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ মোচড় ঘুরিয়া প্রসবের জন্য অধোমুখী হইতে না পারে, তাহা হইলে ঈষদুষ্ণ তৈল গর্ভিণীর কটি, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ এবং উরুতে মাখাইয়া নীচমুখে আস্তে আস্তে মর্দ্দন করিতে থাকিবে। আবার যখন দেখিবে, সন্তান গর্ভমধ্যে তীর্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিতি করিতেছে অথবা ঐ ভাবেই প্রসব হইবার জন্য যোনি-মুখে সমাগত হইয়াছে, তখন প্রসব হওয়া বড় সহজ মনে করিবে না। তদ্রূপাবস্থায় গর্ভিণীর কটিদেশে কিঞ্চিৎ উষ্ণ তৈল মাখাইয়া এমনভাবে ঝাঁকি দিয়া দিবে যে, তৎক্ষণাৎ সন্তান সোজা হইয়া যায় এবং গর্ভিণীও অধিক কষ্ট না পায়।

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বারা জল সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া গর্ভিণীকে পান করিতে দিবে ;—

"ওঁ ক্ষিপ নিক্ষিপ উন্মথ প্রমথ মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা।"

উভয় ত্রিংশৎ বা উভয় পঞ্চদশক দর্শন করিলেও স্ত্রীগণ সহজে প্রসব করে। ৮, ৩, ৪, ১, ৫, ৯, ৬, ৭, ২, এই কয়টী অঙ্ক যথাক্রমে নবকোষ্ঠকে পূরণ করিলে

উভয় পঞ্চদশক হয় এবং উহার দ্বিগুণ সংখ্যা প্রত্যেক ঘরে রাখিলে উভয় ত্রিংশৎ হয়।

উভয় পঞ্চদশক।

৮	১	৬
৩	৫	৭
৪	৯	২

উভয় ত্রিংশৎ।

১৬	২	১২
৬	১০	১৪
৮	১৮	৪

অথবা—যমুনা সরট করট তীরে জম্ভলা নাম রাক্ষসী।
তস্যাঃ স্মরণ মাত্রেণ সদ্যোনারী প্রসূতে॥

এই প্রসব-পত্র দর্শন করিলেও স্ত্রীগণ শীঘ্র সন্তান প্রসব করে। এই সমস্ত কার্য্যদ্বারা কোন ফল না দর্শিলে বিবেচনাপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঔষধ গুলি প্রয়োগ করিবে। যথা—

* ১। সাপের খোসা সরাবপুটে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম মধুর সহিত গর্ভিণীর চক্ষে অঞ্জন দিবে। ইহাতে প্রসব-বাধা দূরীভূত হয়।

২। আকান্ধি, বিষলাঙ্গলীয়া, বাসক ও আপাঙ্গ এই সকলের কোন একটীর মূল উত্তমরূপ বাঁটিয়া নাভি,

বস্তি ও যোনিতে প্রলেপ দিবে। শালপর্ণী মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলেও বিশেষ উপকার হয়।

* ৩। গোপনে একটী ভূলতা উঠাইয়া তাহার এক টুক্‌রা কাটিয়া পানের সহিত গর্ভিণীকে চর্ব্বণ করিতে দিবে। প্রসবের বেগ না থাকিলে ইহাতে অত্যন্ত বেগ উপস্থিত হয়।

* ৪। ছোলঙ্গ লেবুর মূল, যষ্টিমধু, ঘৃত ও মধুর সহিত পান করাইলে গর্ভিণী নির্ব্বিঘ্নে সন্তান প্রসব করে।

* ৫। কাঁজিতে গৃহধূম গুলিয়া পান করিলে শীঘ্র সন্তান প্রসব হয়।

৬। কাঁজি ২ পল, হিঙ্গু ২ রতি, সৈন্ধব এক মাষা একত্রে পান করিলে বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়।

৭। নাগদনামূল ১ মাষা ও চিতামূল ১ মাষা জলের সহিত বাঁটিয়া পান করিলে শীঘ্র গর্ভ নিঃসৃত হয়।

* ৮। যখন দেখিবে, গর্ভমধ্যে সন্তান মরিয়াছে অথচ কোন প্রকারেই প্রসব হইতেছে না, তখন কিঞ্চিৎ সিজ-আটা গর্ভিণীর মস্তকে নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে মৃত-সন্তান বহির্গত হয়।

৯। এই সমস্ত কার্য্য করিলেও যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ না হয়, এবং গর্ভিণীর অবস্থা ক্রমেই নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে, তাহাহইলে চতুরঙ্গুলি পরিমিত এক খণ্ড

* চিহ্নিত ঔষধগুলি পরীক্ষা করা হইয়াছে।

অপামার্গমূল গর্ভিণীর অপত্য-পথে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ইহার এমনই অত্যাশ্চর্য্য আকর্ষণী শক্তি আছে যে সেই শক্তিপ্রভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িবে। কিন্তু কখনও সহজে এই যোগ প্রয়োগ করিবে না। যখন গর্ভিণীর বাহ্যিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়া পড়িবে—ক্ষণকাল বিলম্ব হইলে তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হইবে, কেবলমাত্র তখনই এই ঔষধ ব্যবহার করিবে। ইহাতে নিশ্চয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে।

অনন্তর অম্বিকা কহিলেন, দেব! সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেও ত কখন প্রসূতিকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলিয়া জানা যায় না। কেহ কেহবা প্রসব হইলেই অমনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহাদিগের প্রাণ-বায়ু এত শীঘ্র দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় যে তাহার প্রতীকার করিবারও কিছুমাত্র সময় পাওয়া যায় না। এরূপ হইবার কারণ কি? এবং কি উপায় অবলম্বন করিলেই বা এই বিপদ হইতে মুক্ত থাকিতে পারা যায়।

তখন মহাদেব কহিলেন, প্রিয়ে! সে সকলই তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিতেছি। সন্তানের নাভি-নাড়ীর সহিত প্রসূতির অমরা নামক নাড়ী সংযুক্ত থাকে। এই নাড়ীকে স্ত্রীলোকগণ সাধারণতঃ ফুল কহে। ইহার সহিত প্রসূতির জীবন-মরণের অতি নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহার প্রতি কেহ দৃষ্টি

না করিয়া সর্ব্বাগ্রে প্রসূতিকে লক্ষ্য করিবে, ফুল পতিত হয় কি না, তদ্বিষয় বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। কেননা ফুল পতিত হইতে যতই বিলম্ব হইবে, ততই প্রসূতির পদে পদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা! আবার কোন কোন বিকৃত গর্ভকে যদি প্রকৃতিস্থ কবিয়া প্রসব করাইতে হয়, আর ভাগ্যক্রমে প্রসবের সময় সন্তানের নাভি-নাড়ী ছিঁড়িয়া যায়, তাহাহইলে সেই প্রসূতি তদ্দণ্ডেই কাল-গ্রাসে পতিত হয়। সন্তান নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইলেও যদি কোন অপরিণামদর্শিণী জনয়িত্রী প্রসূতির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া প্রসূত সন্তানের সুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হয় কিম্বা তাহার নাড়ী ছেদন করিয়া দেয়, তাহাহইলে ঐ ফুল বাতাদির দ্বারা আকর্ষিত হইয়া অতি শীঘ্র প্রসূতির উদর-মধ্যে ঊর্দ্ধগামী হইয়া যায় এবং প্রসূতিকেও শীঘ্র বিনষ্ট করিয়া ফেলে। অতএব প্রসূতি খালাস হইলেই অমনি কার্য্যকুশলা জনয়িত্রীগণ তাহার ফুলের প্রতি লক্ষ করিবে। ফুল পড়িতে একটু বিলম্ব হইলে নিম্নলিখিত উপায় সকল অবলম্বন করিবে।

১। একজন জনয়িত্রী দক্ষিণ হস্তদ্বারা প্রসূতির নাভির উপর বলপূর্ব্বক পীড়ন করিবে। এবং বাম হস্ত পৃষ্ঠের উপর রাখিয়া অতিশয় কাঁপাইবে।

২। পদদ্বারা প্রসূতির নিতম্ব কুটিল করিয়া ধরিবে।

৩। তাহার পর স্ফিচদ্বয় উত্তমরূপে চাপিয়া অবিরত পীড়ন করিবে।

৪। প্রসূতির কেশের অগ্রভাগ তাহার মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে।

৫। অথবা কেশের অগ্রভাগ অঙ্গুলিতে বেষ্টন করিয়া যোনিদ্বার ঘর্ষণ করিবে।

এই সকল কার্য্যদ্বারা অমরা পতিত না হইলে পরিশেষে ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

১। ভূর্জ্জপত্র, কাচ এবং সাপের খোসা একত্রে দগ্ধ করিয়া যোনিতে তাহার ধুঁয়া দিবে।

২। সর্ষপতৈলের সহিত তিত লাউ, সাপের খোসা, ঘোষাফল ও সর্ষপ প্রভৃতির ধূপ প্রদান করিলে অমরা পতিত হয়!

৩। প্রসূতির হস্তে ও পদে ঈষলাঙ্গুলীয়ার মূলদ্বারা প্রলেপ দিলেও শীঘ্র অমরা পতিত হয়।

৪। পিপুল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, হরীতকী, আমলকী ও শটি, এই সমুদায় দ্রব্যের চূর্ণ মদ্যেব সহিত অথবা শালীধান্যের মূল মদ্য বা কাঁজির সহিত পান করিবে।

৫। উলুমূল, কুলত্থ কলায়, দন্তী ও পিপুল, ইহাদের মধ্যে কোন একটীর ক্বাথের সহিত অথবা সুরামণ্ড বা মৈরেয় নামক মদ্যের সহিত কুড় ও তালিস পত্রের কল্ক মিশ্রিত করিয়া পান করিবে।

৬। শলুফা, কুড়, হিঙ্গু ও মদনফলদ্বারা সিদ্ধ তৈলে তুলা ভিজাইয়া যোনিতে প্রদান করিবে।

যাহাতে বাতাদির অনুলোম সাধিত হয়, এরূপ কোন কার্য্য করিলে অবশ্যই ফুল পড়িয়া যাইবে। কেননা, মলমূত্রাদি নানাপ্রকার অন্তর্মুখ এবং বহির্মুখ পদার্থ সকল বায়ু দ্বারা ঐ ফুলের সহিত সংলগ্ন থাকে, তাহাতেই ফুল পড়িতে কাহারো কাহারো কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। এই সকল কার্য্যদ্বারাই হউক অথবা ইহার পূর্ব্বেই হউক, ফুল পড়িয়া গেলে, প্রয়োজনমত তৈল জলাদি দ্বারা একজনে প্রসূতিকে সুস্থ করিতে থাকিবে এবং অন্যান্য সকলে সদ্যপ্রসূত সন্তানের যথোচিত সুশ্রূষা ও তাহার জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিবে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই যদি কাঁদিয়া উঠে, তাহা হইলে শীতল বা ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা তাহার গাত্র বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিবে এবং কাশ-নির্ম্মিত রজ্জু-বদ্ধ এক খান কুলা দ্বারা কিছুকাল বাতাস করিবে। এইরূপ করিলে গর্ভ-নিষ্ক্রামণ-জনিত ক্লেশ দূর হয় এবং নবপ্রসূত শিশু অচিরে প্রাণ লাভ করে। সন্তান প্রকৃতিস্থ হইলে তাহাকে স্নান করাইবে এবং মলদ্বার ধৌত করিয়া দিবে। পরে এক জন সুশিক্ষিতা স্ত্রী আপনার নখাদি উত্তমরূপ ছেদন করিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলীর অগ্রভাগ তুলা দ্বারা বেশ করিয়া জড়াইবে এবং তদ্দ্বারা ঐ সদ্যজাত

শিশুর কণ্ঠ, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও তালু মার্জ্জন করিয়া দিবে। পরে সৈন্ধব-যুক্ত ঘৃত দ্বারা শিশুকে বমন করাইবে। তাহাতে কোকিলের ন্যায় স্বর ও বাক্-শক্তি বৃদ্ধি পায়, নতুবা ঐ বালক তোতলা, অস্পষ্টভাষী ও মূক হইতে পারে।

আবার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেও যদি কাঁদিয়া না উঠে এবং একবারে নিস্পন্দভাবে মৃতবৎ পড়িয়া থাকে, অথচ তাহার বর্ণের ঈষৎ নীলত্ব ভিন্ন অঙ্গের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই এরূপ দেখা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় বুঝিবে যে ঐ সন্তান গর্ভ-নিষ্ক্রামণ-জণিত যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছে, অথবা তাহার প্রাণ-বায়ু নাভি-নাড়ী দ্বারা অমরামধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। একটু সুশ্রূষা করিলেই তাহার প্রাণ আবার প্রত্যাগত হইবে। কিন্তু অধিক বিলম্ব হইলে বা নাড়ী কাটিয়া ফেলিলে আর তাহার বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে না।

সন্তানের নাভি-নাড়ীর যে দিক্ ফুল-সংযুক্ত থাকে, সেই দিক্ হইতে অর্থাৎ ফুলের মধ্য হইতে আস্তে আস্তে টিপিতে টিপিতে ক্রমে নাভির দিক্ আসিতে হইবে। এই রূপ করিলে ঐ ফুল হইতে ক্রমশঃ রক্ত সঞ্চালিত হইয়া সন্তানের শরীরে প্রবেশ করে এবং তাহার প্রাণও প্রত্যাগত হয়। ইহাতেও যদি ঐ সন্তান কাঁদিয়া না উঠে, তবে অবিলম্বে একটী মৃৎ পাত্রের উপর ঐ ফুল

সংস্থাপন করিয়া পাত্রটী শূন্যভাবে রাখিবে এবং নীচে আগুণ জ্বালিয়া পাত্রস্থিত ফুলকে নাড়া চাড়া করিয়া তুলিবে। তাহা হইলে অচিরে সদ্যজাত শিশু কাঁদিয়া উঠিবে এবং পরে উল্লিখিত কার্য্যাদি দ্বারা সন্তানের সুশ্রূষা করিতে থাকিবে।

এই কথা শুনিয়া চরাচর প্রসবিণী জগৎপালিনী এবং অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গল-বিধায়িনী মহামায়া কহিলেন, হে আদি পুরুষ! কি জন্য জীবগণ ভূতলে প্রবিষ্ট হইয়াই অমনি কাঁদিয়া উঠে? আর কেনই বা সেই ক্রন্দনকে সকলে মঙ্গল-জনক বলিয়া মনে করে?

তখন নিখিল জগতের আধারভূত অচিন্ত্য-শক্তি মহাদেব কহিলেন, প্রিয়ে! সংসারে সকলেই আপন আপন কর্ম্মের ফল ভোগ করে। সেই কর্ম্মবশে জীবগণ পাশবদ্ধ বানরের ন্যায় পুনঃ পুনঃ সংসার-সাগরে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়। যে প্রকার নিশিযোগে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলে দিবাভাগে চেতনাবস্থায়ও তাহা বেশ মনে থাকে, কিন্তু আবার নিদ্রাকর্ষণ হইলে তাহার বিন্দুমাত্র ও স্মরণ হয় না; সেইরূপ চৈতন্যস্বরূপ জীবগণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত চেতন থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার সাক্ষাৎকার-লাভে বঞ্চিত না হয়, ততক্ষণ তাহাদের সমস্ত কথাই মনে থাকে, ততক্ষণ তাহাদের দুরতিক্রম্য জঠর-যন্ত্রণার কথা——অনন্ত সংসারের অনন্ত যন্ত্রণার কথা একে

একে হৃদয়-ক্ষেত্রে উদয় হইয়া অনুতাপানলে তাহাদিগকে সর্ব্বদা দগ্ধীভূত করিতে থাকে। কিন্তু যেই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মবশে আবার জীব-দেহ ধারণ করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হয়, অমনি সমুদায় তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া ঘোর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তখন আবার আপনার অভিরুচি-মত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। আবার পর জন্মে সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করে। ইত্যাকারে জীবগণ নিয়ত সংসার-চক্রে পরিভ্রমণ কবিতেছে। প্রিয়তমে! তোমাকে আর নূতন করিয়া বেশী কি বলিব? প্রথমতঃ সামান্য জরায়ুমধ্যে জীবদিগের সামান্য দেহ অবস্থিতি করে, পরে কাল সহকারে সেই দেহ বর্দ্ধিত হইলে যখন সেই অপ্রশস্ত স্থানে থাকিতে না পারিয়া ঘোর ফাঁফরে নিয়ত ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, আব কৃতাঞ্জলিপুটে নানাবিধ স্তুতি স্তব করিয়া আমার নিকট স্থান প্রার্থনা করে, আমি তখন হৃষ্টচিত্তে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে নির্গমনের পথ দেখাইয়া দেই। তাহারাও আর নীতি-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সংসারে জন্ম গ্রহণ করে। জন্ম গ্রহণ করিয়াই "ওঁ" শব্দে আমাকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তুমিই তখন মহামায়া-রূপে সংসারে বিদ্যমান থাকিয়া ঘোর মোহ-পাশে জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেল, তখন তাহাদের জিহ্বা জড়তা প্রাপ্ত হয়, আর কিছুই বলিতে পারে

না। সুতরাং কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কাঁদিয়া ফেলে; আর সেই অর্দ্ধোচ্চারিত "ওঁ" শব্দ "ওঁয়া" বা "ওঁঙ্গা" হইয়া অনন্ত বায়ুরাশির মধ্যে ভাসিয়া যায়। তাই বলি প্রিয়ে! একবার মনে করিয়া দেখ, যদি ইহাই না হইবে, তবে ম্লেচ্ছ, কিরাত এবং সৌমার প্রভৃতি যে কোন জাতিই কেন না হউক, সকলেরই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে "ওঁ" বা "ওঁঙ্গা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিবে কেন? সকলকেই এই এক শব্দ কে শিখাইয়া দিল? আবার দেখ, সমস্ত জীবনকাল জীবগণ আপনার ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম করিয়া যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ঘোর মৃত্যু-যন্ত্রণায় অধীর হইয়া যখন বারম্বার ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, যখন কর্ণ থাকিতে শুনিতে পায় না——চক্ষু থাকিতে কিছুমাত্র দেখিতে পায় না——জিহ্বা থাকিতে কিছুই প্রকাশ করিতে পারে না, সেই সময় আবার আমার কথা মনে পড়ে। সেই সময় আবার "ওঁ" বলিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করে। কিন্তু আর চেষ্টা করিলে কি হইবে? যেই অব্যক্তভাবে প্রথমার্দ্ধ উচ্চারিত হয়, অমনি শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত অপরার্দ্ধ অনন্ত আকাশে মিশিয়া যায়। আর বলিয়া শেষ করিতে পারে না। এই সম্বন্ধে আর অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না। ইহা বলিলে ফুরাইবার নয়। এইক্ষণ সদ্যজাত সন্তানের নাড়ী-ছেদনের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

যে জনয়িত্রী নাড়ী ছেদন করিবে, তাহাকে অত্যন্ত সাবধান হইতে হইবে। একবারে গোড়া ঘেঁষিয়া বা অধিক লম্বা করিয়া কখনও নাড়ী ছেদন করিবে না। অথবা ঘষিয়া ঘষিয়া বা অসমান করিয়া নাড়ী কাটিলেও সন্তানের নানা প্রকার দুশ্চিকিৎস্য কঠিন পীড়া জন্মে। সেই সকল পীডার কথা পরে বিশেষ করিয়া বলা যাইবে। নাড়ী ছেদনের জন্য তীক্ষ্ণ ও ঊর্দ্ধধার রজত বা লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। সাধারণতঃ গরিব লোকেরা বাঁশের নেইল দ্বারা কাটিয়া থাকে। প্রসূত সন্তানের নাভিমূল হইতে ৭।৮ অঙ্গুলী পরিত্যাগ করিয়া যে স্থান কাটিতে হইবে, সেই স্থান নির্দ্দেশ পূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্তে তাহার দুই পার্শ্ব ধারণ করিয়া ঝটিতি কাটিয়া ফেলিবে। পরে ঐ ছিন্ন নাড়ীর ছিন্ন পার্শ্ব সূত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া কুমারের গ্রীবাতে ঝুলাইয়া দিবে।

নাড়ী ছেদনের পর আপনাপন বেদানুযায়ী কার্য্য-সকলের অনুষ্ঠান করিবে এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্র দ্বারা যথা-রীতি ঘৃত ও মধু সংস্কৃত করিয়া ঐ বালককে লেহন করিতে দিবে। অনন্তর স্তন্য-দায়িণী উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া পূর্ব্বমুখে সুখাসনে উপবেশন করিবে এবং প্রসূত বালকের মস্তক উত্তর দিকে রাখিয়া তাহার শিয়রে মন্ত্র-সংস্কৃত জল-পূর্ণ-কুম্ভ স্থাপন করিবে। পরে দক্ষিণ স্তন ধৌত ও মন্ত্রঃপূত করিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধ নিঃসরণ করিয়া

ফেলিবে এবং আস্তে আস্তে বালককে ক্রোড়ে লইয়া স্তন্য পান করাইবে। প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ দুগ্ধ নিঃসারিত করিয়া না ফেলিলে বালকের গলনলীতে অধিক পরিমাণে দুগ্ধ প্রবিষ্ট হওয়ায় ঐ বালক শ্বাস, কাস ও বমিতে অত্যন্ত পীড়িত হইতে পারে। বালককে প্রথমতঃ স্তন্য পান করাইবার পূর্ব্বে কোন সুযোগ্য ব্রাহ্মণ অথবা ঐ বালকের পিতা নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিবেন। সেই সময় স্তন্যদাত্রী দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দক্ষিণ স্তন স্পর্শ করিয়া থাকিবে।

"ক্ষীর-নীর নিধিস্তেহস্তু স্তনয়োঃ ক্ষীর-পূরকঃ।
সদৈব সুভগো বালো ভবত্বেষ মহাবলঃ॥
পয়োহমৃত সমং পীত্বা কুমারস্তে শুভাননে।
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতুঃ দেবাঃ প্রাপ্যামৃতং যথা॥"

উপরোক্ত-রূপে স্তন্যপান করাইলে ঐ শিশুর রক্ষার নিমিত্ত আদানী, কর্কন্ধু, খদির, পীলু এবং ফল্‌সা, এই সমুদায়ের যথা-প্রাপ্ত শাখা দ্বারা সূতিকাগারের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া দিবে। ঘরের মধ্যভাগে সর্ব্বত্রই শ্বেত সর্ষপ, মসিনা এবং চাউলের ক্ষুদ ছড়াইয়া ফেলিবে। দ্বারদেশে একটী মুষল বক্রভাবে স্থাপন করিবে। বচ, কুড়, ক্ষৌমক, হিঙ্গু, শ্বেত সর্ষপ, মসিনা, রশুন ও চাউলের কুঁড়া, এই সমুদায় দ্রব্যকে রক্ষোঘ্ন ঔষধ বলে। এই সমুদায় ঔষধ পুঁটলী বদ্ধ করিয়া সূতিকা ঘরের

উত্তর দিকে ঝুলাইয়া রাখিবে। বুদ্ধিমতী মিষ্ট-ভাষিণী স্ত্রীলোকগণ সর্ব্বদা সূতিকা-ঘরে জাগরিত থাকিয়া দুই বেলা কুল-প্রথানুসারে মঙ্গলজনক কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

একদা বিশ্বজননী ভবানী জীবন-সহচরী জয়া-বিজয়া-সহিত বিচিত্র কদম্ব-কাননে বিচরণ করিতেছিলেন*। ভূলোক, দ্যুলোক প্রভৃতি বিশাল গোলকের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে সহসা বিজয়া কহিলেন, মাতঃ! সৃষ্টি সৃষ্টি করিয়া তোমাকেই যে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতে দেখি। যোগেশ্বর কৈলাস-নাথ ত কখনও কিছুতে লিপ্ত হয়েন না! তবে কি তাঁহার অপেক্ষা তোমারই যোগ্যতা অধিক? আর যদি তাহাই হয়,

---

* যে দিকে মহামায়ার আবির্ভাব, সেই দিকের জয়ও অবশ্যম্ভাবী, তাই জয়া বিজয়া তাঁহার চিরসহচরী।

প্রাচীন ঋষিগণ বড়ই অলঙ্কার-শাস্ত্রের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহাদিগের রচিত নানাবিধ শাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণাদিতে রূপক অলঙ্কারের বড়ই ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল রূপকের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া বর্ত্তমান ম্লেচ্ছভাষাজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রকৃত শাস্ত্রকে সময় সময় একবারে অশাস্ত্ররূপে পরিণত করেন। ভগবান বশিষ্ঠ শ্যামা-কবচের ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া একস্থলে বলিয়াছেন—"কদম্ব-বন-সঞ্চারা কদম্ববন-বাসিণী। কদম্ব-পুষ্প-সন্তোষা কদম্ব-পুষ্প-মালিনী॥" অর্থাৎ নিখিল জগতের আধার যে একমাত্র আকাশ, তাহাকে তিনি কদম্ব-বৃক্ষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতি-রূপিণী মহাদেবী সেই কদম্ববনে বিচরণ করিয়া বেড়ান। ফলতঃ নিশাকালে নভোমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলে চতুর্দ্দিক্ হইতে যখন অসংখ্য অসংখ্য

তবে কেনই বা সকলে তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করে? কোন্ গুণেই বা তিনি জগৎপিতা নাম ধারণ করিলেন?

এই কথা শুনিয়া পরমেশ্বরী ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! এখনও তোমাদের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইতে অনেক বিলম্ব আছে, এখনও তোমাদের জ্ঞান-নেত্র সম্পূর্ণ উন্মীলিত হয় নাই, তাই সেই ত্রিলোক-পিতা সৃষ্টি-পতিকে বৃথা যোগ্যতা-হীন বলিয়া কল্পনা করিতেছ। ফলতঃ সেই অসীম যোগ্যতার সহিত আমার এই সামান্য যোগ্যতার তুলনা করাও একপ্রকার বাতুলতা। সদ্য-

---

প্রস্ফুটিত কদম্বসমূহ নয়ন পথে পতিত হয়, তখন কেইবা এই কথা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে? তখন কোন মূঢই বা সেই সৃষ্টিকর্ত্তার অদ্ভুত সৃষ্টি-বিষয় ভাবিতে ভাবিতে ভক্তি ভাবে বিগলিত না হয়? আবার ব্যাসদেব যে গোপীদিগের বস্ত্র-হরণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কদম্ব-বৃক্ষারোহণের কথা লিখিয়াছেন, তাহাও এই বৃক্ষ ভিন্ন আর কিছুই নয়। তবে কতকগুলি ভক্তি-বিটল পাষণ্ড বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ইহাকে নিতান্ত জঘন্য আকারে পরিবর্ত্তন করিয়াছে। তাহারা পবিত্র কৃষ্ণ-চরিত্রে যে অযথা দোষারোপ করিয়া বেড়ায়, তাদৃশ দোষ ঈশ্বরে থাকা অসম্ভব। মহাত্মা ভাস্করাচার্য্য নিজ প্রবর্ত্তিত জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রথমেই "কদম্ব প্রসূনবৎ পৃথ্বী" এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয় কদম্ব-পুষ্প ইউরোপ প্রভৃতি দেশে দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই তত্রত্য পণ্ডিতগণ কমলালেবুর সহিত পৃথিবীর তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কমলালেবু অপেক্ষা কদম্বপুষ্পের সহিত পৃথিবীর অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। প্রস্ফুটিত কদম্বের ন্যায় পৃথিবীরও রেণু আছে। এস্থলে সেই সমুদায় উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

প্রসূত সন্তান মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই যেমন কিছু বুঝিতে পারে না, এবং কাহাকেও চিনিতে পারে না, পরে মাতৃ-যত্নে বর্দ্ধিত হইতে হইতে প্রথমে মাতাকেই চিনে, এবং অপেক্ষাকৃত জ্ঞানলাভ করিলে শেষে পিতাকেও চিনিতে পারে; অজ্ঞানান্ধ জীবের সম্বন্ধেও এই কথা জানিবে। মাতৃসেবায় অর্থাৎ আমার উপাসনায় আমার অনুগ্রহ-ভাজন হইয়া জ্ঞানের পথ প্রশস্ত করিতে না পারিলে অথবা দিব্য-জ্ঞান-লাভে বঞ্চিত থাকিলে, কখনও সেই বিশ্বনিয়ন্তা পরম পিতাকে কেহ জানিতে পারে না। সুতরাং তাদৃশ জীবের পক্ষে মোক্ষলাভও সুদুর্লভ। জগৎ-প্রসব-সম্বন্ধে আমি কেবল উপলক্ষমাত্র। সেই অচিন্ত্য-শক্তি বিশ্বনাথের যে শক্তি হইতে সৃষ্টি সমদ্ভূত হয়, তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য অপরিসীম গুণের বিষয় আমারও বচনাতীত, সুতরাং তোমাকেই বা তাহা কি প্রকারে বুঝাইয়া দিব?

বিজয়া। আমিও ত আর কিছু শুনিতে চাই না। সৃষ্টিপ্রকরণের বিষয় বলিলেই আমারও বাসনা পূর্ণ হয়।

পার্ব্বতী। তবে তাহাই বলিতেছি—তুমি যাহা কিছু দেখিবে—পার্থিব অপার্থিব যাহা কিছু তোমার নয়ন-পথে পতিত হইবে, প্রকৃতি এবং পুরুষই তদুৎপত্তির একমাত্র

বিজয়া। সেই পুরুষ কে? এবং প্রকৃতিই বা কাহাকে বলে?

পার্ব্ব। যিনি অব্যক্ত, অব্যয়, অজর এবং অলিঙ্গ; যিনি শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র এবং আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতে বিভক্ত হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন, যাঁহার আদিতে কিছুই ছিল না এবং পরেও কিছু থাকিবে না; তিনিই পুরুষ। যাহা বিশ্বস্থষ্টির একমাত্র কারণ এবং সত্ব, রজঃ, তমো গুণান্বিত, যাহা না হইলে কেবল পুরুষের সাহায্যে এই বিশ্ব-রাজ্যের কিছুই উৎপত্তি হইত না, তাহাকেই প্রকৃতি বলে।

বিজয়া। প্রকৃতির সহিত পুরুষের এমন কি সম্বন্ধ রহিয়াছে যে তাহা না হইলে কিছুই হইত না?

পার্ব্ব। বিজয়ে! আজ এমন নির্ব্বোধের ন্যায় কহিতেছ কেন? একবার মনে করিয়া দেখ, এই যে তুমি এখানে অবস্থিতি করিতেছ, তোমার ইচ্ছা না হইলে কি তুমি এখন কিছু করিতে পার? ইহা যেমন অসম্ভব, তেমনি সেই সুখদুঃখরহিত নিষ্ক্রিয় মহাপুরুষের প্রকৃতিব্যতীত বিশ্বোৎপত্তিও অসম্ভব। আবার পুরুষের অভাব হইলে প্রকৃতিই হইত না, সুতরাং স্থষ্টিও হইতে পারিত না। তবেই দেখা যাইতেছে যে, পুরুষ এবং প্রকৃতি এই উভয়ই অখিল ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তির একমাত্র কারণ।

জয়া। তবে ত যাহারা মোক্ষ-পদ-প্রত্যাশী, তাহা

দিগের পক্ষে প্রকৃতি-পুরুষের একত্রে উপাসনা করাই যুক্তিযুক্ত।

পার্ব্ব। হাঁ, যাহারা দিব্য-জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহারা তাহাই করে বটে। নির্ম্মল জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে যাহারা আলোকিত হইয়াছে, তাহারা এই উপাসনাকেই জীবনের সার বলিয়া মনে করে। যদি একবার অনিত্য মায়া-বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিষ্কাম এই উপাসনায় মনপ্রাণ ঢালিয়া দেওয়া যায়, তবে সেই মোক্ষরূপ চিরশান্তিতে প্রশান্ত হইবার জন্য বিশুদ্ধাত্মা আপনা হইতেই শান্তিধামের অভিমুখে ধাবিত হয়। তজ্জন্য আর বিশেষ কোনও চেষ্টা করিতে হয় না। কিন্তু মায়া-বন্ধন ছিন্ন করিয়া ভক্তি-যোগ অভ্যাস করা অতীব দুরূহ। তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

জয়া। কি প্রকারে মায়া-বন্ধন ছিন্ন করা যায়? এবং ভক্তি-যোগ অভ্যাস করিবারই বা উপায় কি?

পার্ব্ব। যাহারা কামনা করিয়া উপাসনা করে, তাহাদিগের পক্ষে কৈশোর যৌবনাদি কালাকালের কোনও নিয়ম নাই। যাহারা নিষ্কাম উপাসনার অভিলাষী, তাহাদিগকে প্রথমে যথোচিত জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে হইবে। পরে একদিকে সংসার-বাসনা-পরিতৃপ্তি—অন্যদিকে একটু একটু করিয়া ভগবানে চিত্ত-সংযম এই উভয় কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এইরূপে ক্রমে

ক্রমে সংসার হইতে অপসৃত হইয়া বিশ্বপতির অতুল-প্রেমে মনপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিতে পারিলে শেষে আর কিছুই করিতে হয় না। কোন কোন লোক আপনা-দিগের ভক্তিভাব অটল রাখিবার জন্য যে একখানি শব-শিবারূঢা মুক্তকেশী চতুর্ভুজা কালীমূর্ত্তি সম্মুখে স্থাপন করিয়া একচিত্তে পূজা করে, তাঁহাও এই উপাসনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। ইহাকেই প্রকৃতির উপাসনা কহে। মায়া-বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভক্তিযোগ অভ্যাস করি-বার পক্ষে ইহাই প্রশস্ত। প্রকৃতি কখনও আশ্রয়ীভূত পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না, তাই সেই লোলরসনা উগ্রচণ্ডা চামুণ্ডার উগ্রমূর্ত্তি খানি মহা-দেবের উপর স্থাপিতা। সেই নৃমুণ্ডমালিনী দিগম্বরীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তিখানির উপর দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টতঃই বোধ হয় যেন মহাকালী নির্ব্বিকার মহাপুরুষের দেহ হইতে সমুত্থিতা হইয়া এই বিশাল জগৎ প্রসব করিয়াছেন।

বিজয়া। মাতঃ! প্রকৃতি এবং পুরুষ হইতে কি প্রকারে জগতের উৎপত্তি হইল? তাহাও শুনিতে ইচ্ছা করি।

পার্ব্বতী। বিজয়ে! তোমাকে আর বেশী কি বলিব? এইমাত্র যাঁহাকে যোগ্যতাহীন বলিয়া স্থির করিলে, তিনিই সেই পুরুষ এবং আমাকেই তাঁহার প্রকৃতি বলিয়া

জানিবে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যতীত আমাদিগের স্বরূপ কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। সংসারে যাহা কিছু দেখিবে, সকলই আমাদিগের আদর্শ। সৃষ্টির প্রথমে যখন কিছুই ছিল না, তখন আমিই তাঁহা হইতে অভ্যুত্থান করিয়াছিলাম। আমার সহযোগে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল দেখিয়া কেহ কেহ আমাকেই আদি বলিয়া স্থির করেন; কিন্তু তাহা ভ্রম। প্রকৃত পক্ষে তাঁহা হইতেই আমার উৎপত্তি হইয়াছে। পরে সেই মহাপুরুষ আমার সহিত অপূর্ব্ব সুরতে রত হইলে সর্ব্বাগ্রে আকাশ এবং পরিশেষে একে একে বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। ইহাদিগকেই মহাভূত কহে। ভূতনাথ এই সকল ভূত দ্বারাই সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এই সকল উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে আবার ধৃতি, মেধা প্রভৃতি মহদ্‌গুণ রাশিও সমদ্ভূত হইয়াছিল। এই যে গ্রহ-নক্ষত্র-শোভিত বিচিত্র বিমান-স্থিত বিশাল জগৎ দেখিতেছ, এইরূপ আরও শত শত জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাদিগের জন্য আরও পৃথক্ পৃথক্ চন্দ্র সূর্য্য নিযুক্ত আছে।

বিজয়া। মাতঃ! এই যে চন্দ্র-সূর্য্য-সমন্বিত প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড শূন্যভরে ঝুলিয়া রহিয়াছে, ইহারা স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া কেনই বা সরিয়া পড়িতেছে না?

পার্ব্ব! বৎসে! আপাততঃ তোমরা যে সেই বিশ্ব-পতিকে নিষ্ক্রিয় বলিয়া মনে কর, প্রকৃত পক্ষে তাহা ভ্রম। তিনি নিয়ত আপনার রুদ্র-তেজ দ্বারা এক একটী ব্রহ্মাণ্ডকে পৃথক্‌ভাবে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং স্থানচ্যুত হইয়া কোনটাই কোন্ দিকে সরিয়া যাইতে বা পরস্পর পিষ্ট হইতে পারিতেছে না। আবার দেখ, সংসারে তাঁহা অপেক্ষা বৃহৎ আর কিছুই নাই, সুতরাং তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। তদনুসারে প্রত্যেক বস্তুই একটু একটু করিয়া প্রতি মূহুর্ত্তে তাঁহার দিকে আকর্ষিত হইতেছে। এইরূপে যখন সকলই যাইয়া তাঁহাতে যুক্ত হইবে, তখনই মহাপ্রলয় হইবে। তিনি ভিন্ন আর কিছুই থাকিবে না। তোমার আমারও অস্তিত্ব লোপ হইবে।

বিজয়া। ভক্ত-বৎসলে! পৃথিবীর উৎপত্তির বিষয় যাহা কিছু শুনিলাম, ইহাই যথেষ্ট, এইক্ষণ প্রাণী সমূ-হের বিষয় শুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে।

এইরূপে তাঁহারা কথোপকথন করিতে করিতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। সহসা পার্ব্বতী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! আর আমাকে অধিক বলিতে হইবে না। ঐ যে দেখ একটী মহাপুরুষ নীরবে বসিয়া মনে মনে কি ধ্যান করিতেছেন; এস,

আমরা তাঁহার নিকটে যাইয়া সবিস্তার সমুদয় শ্রবণ করি।

অনন্তর শিব-বক্ষ-বিহারিণী পার্ব্বতী জয়া-বিজয়া-সহিত সেই মহাপুরুষের চিত্তাকর্ষণ করিয়া কহিলেন, হে যোগী-জন-বল্লভ যোগেশ্বর! হে সর্ব্ব-সন্তাপ-হারী মহাকাল! হে গৃহী-জনের আদর্শ ত্রিলোচন! তুমি সর্ব্বান্তর্যামী—সকল বিষয়েই সম্যক্ পরিজ্ঞাত, এই যে খর-স্রোত সংসার-সমুদ্রে জীব-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, কি প্রকারে এই জীব-দেহের উৎপত্তি হয়, আজ তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি।

এই কথা শুনিয়া সর্ব্ব-লোক-রঞ্জন দেবাদিদেব মহাদেব কহিলেন, প্রিয়ে। জীবোৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল নিগূঢ় রহস্য আছে, আজ তাহাই তোমাকে কহিতেছি। যে প্রকার আমার সঙ্গমে তোমা হইতে এই বিশাল জগৎ সমুত্থিত হইয়াছে, সেই প্রকার আমার ইচ্ছানুসারে পিতা মাতার সঙ্গমে তাহাদের দেহস্থ শুক্র শোণিত পরস্পর সংযুক্ত হইয়া সংসারে জীবস্রোত ক্রমশঃ প্রবল করিতেছে। তন্মধ্যে কতকগুলি জীবের জন্মগ্রহণ করিতে পিতা মাতা কাহারও আবশ্যক হয় না। তাহারা আপনা হইতেই মল মূত্রাদি ক্লেদোময় পদার্থের নির্য্যাস হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাদৃশ প্রাণীর বিষয় বলিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। যাহারা

পিতামাতার দেহসম্ভূত শুক্রশোণিতের সহযোগে জরায়ু মধ্যে অবস্থিতি করিয়া কালসহকারে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাদের কথাই কহিতেছি, শ্রবণ কর—

পার্ব্বতী। তবে নাথ! এই যে বলিলে, পদার্থ বিশেষের নির্য্যাস হইতেও প্রাণী-বিশেষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেইরূপ যে যে উপকরণ একত্রিত হইলে মানবদেহের উৎপত্তি হয়, তাহা অন্য উপায়ে পরস্পর সংযোগ করিয়া দিলে কি পিতামাতাব্যতীত মানবোৎপত্তি হইতে পারে না?

মহা। না, তাহা অসম্ভব। ক্রিমি কীটাদির সহিত কখনও মানবদেহের তুলনা হইতে পারে না। বিশেষতঃ যে যে উপকরণে মানবদেহের উৎপত্তি হয়, শুক্রশোণিত ব্যতীত তাহা অন্য কোন পদার্থে নাই এবং হইতেও পারে না। আবার সেই শুক্রশোণিতও পিতা মাতার দেহ হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং মানব বা জরায়ুজ প্রাণীর উৎপত্তি-সম্বন্ধে পিতা মাতাই প্রধান কারণ।

পার্ব্বতী। আচ্ছা, পিতামাতার দেহস্খলিত শুক্রশোণিত মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া দিলে কেনই বা তাহাতে জীব-দেহ সংগঠিত না হয়?

মহা। প্রিয়ে! তাও কি হয়? উপযুক্ত বীজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে বপন করিলে তাহা হইতে যেমন

আশানুযায়ী শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ উৎকৃষ্ট বীজ যে কোন ক্ষেত্রে ছড়াইয়া ফেলিলেই কি সেইরূপ হয় ? আবার সকল প্রকার বীজ কখনও সকল প্রকার ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইতে পারে না। কোন কোন শস্য উৎপন্ন হইতে রসাল ক্ষেত্রেব আবশ্যক হয়, কোন কোন শস্য তাহাতে একেবারেই হয় না। জরায়ুজ প্রাণীর উৎপত্তিসম্বন্ধেও তাহাই জানিবে। মানুষ, গরু প্রভৃতি প্রাণীগণ জরায়ু ব্যতীত আর কোথায়ও সংগঠিত হইতে পারে না, উহাই তাহাদের পক্ষে একমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্র। ঐ ক্ষেত্র স্ত্রীলোকের দেহ ভিন্ন আর কোথায়ও গঠিত হয় নাই। ইহা ঠিক্ জানিও যে এক একটী জীব-দেহ এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আদর্শ স্বরূপ। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, জীব-দেহেও তাহাই আছে, ব্রহ্মাণ্ড যেমন তোমা কর্ত্তৃক একবার চালিত হইয়া সেই নিয়মেই চলিয়া আসিতেছে, জীব দেহও সেইরূপ মাতৃগর্ভে অবস্থিতি করিয়া সেই দেহস্থিত প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান এবং সমান কর্ত্তৃক দশমাস পর্য্যন্ত চালিত হইয়া পরে সেই নিয়মেই অবিরত চলিয়া থাকে। আবার এই ব্রহ্মাণ্ডও যেমন একদিন প্রকৃতিবশে উপযুক্ত সামগ্রীর অভাবে আমাতে বিলীন হইবে, জীবদেহও সেইরূপ মধ্যে মধ্যে বিনাশ হইয়া থাকে। এইজন্যই জীব-দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড কহে।

পার্ব্ব। নাথ! এই যে জরায়ুর কথা কহিলে, এই জরায়ু কি? এবং ইহার আকৃতিই বা কিরূপ?

মহা। মলদ্বার এবং মূত্র দ্বার ইহার মধ্যভাগে যে একটী দ্বার লক্ষিত হয়, তাহাকে যোনিদ্বার কহে। ইহার আকৃতি ঠিক্ শঙ্খ-নাভির ন্যায় এবং ইহার অভ্যন্তরে তিনটী আবর্ত্ত আছে। তাহারই তৃতীয় আবর্ত্তে রোহিত মৎস্যের মুখের ন্যায় যে একখান আবরণ লক্ষিত হয়, তাহাকেই গর্ভ-শয্যা বা জরায়ু কহে। এই গর্ভ-শয্যার স্থিতি এবং আকৃতি প্রায়ই রোহিত মৎস্যের মুখের ন্যায়। অর্থাৎ রোহিত মৎস্য যেমন জলমধ্যে অবস্থিতি করে, ইহাও তেমনি পিত্তাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যে স্থাপিত রহিয়াছে। রোহিত মৎস্যের যেমন মুখ ক্ষুদ্র, কিন্তু আশয় মহৎ, তদ্রূপ গর্ভ-শয্যার মুখ ক্ষুদ্র হইলেও তাহার আশয় মহৎ। ইহাই জীবোৎপাদনের একমাত্র ক্ষেত্র।

পার্ব্ব। ঋতুকাল কাহাকে বলে? কেনই বা সেই সময় রমণীদিগের যোনি-দ্বার দিয়া শোণিতস্রাব হয়? এবং কি প্রকারেই বা সেই শোণিতের উৎপত্তি হইয়া থাকে?

মহা। সুকুমারী কামিনীগণ কৌমার অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলে তাহাদের দেহস্থ রস আর্ত্তবরূপে পরিণত হয় এবং সময় সময় ঈষৎ বিবর্ণ

হইয়া বায়ু সহকারে যোনি দ্বারা নির্গত হইয়া যায়। এই সময়কেই ঋতুকাল কহে। শরীরস্থ ভুক্ত বস্তু বারম্বার পক্ক হইতে হইতে রক্ত, মাংস, মেদ প্রভৃতি কান্তিজনক ও পুষ্টিকারক এক একটী পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে একমাসের পর পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীলোকের আর্ত্তব প্রস্তুত হয়। আর্ত্তব ব্যতীত স্ত্রীদিগেরও আবার শুক্রবৎ এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহাও গর্ভ গ্রহণের অন্যতম কারণ। দ্বাদশ বৎসর হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীদিগের প্রতি মাসে এক একবার কবিয়া এই আর্ত্তবস্রাব হয় এবং সাধারণতঃ উহা তিন দিন কাল স্থায়ী থাকে। তবে শারীরিক বল এবং কোন প্রকার ব্যাধির তারতম্যানুসারে এই নিয়মেব বিপরীত ভাবও কোন কোন সময় কোন কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে দৃষ্ট হয়। তাই বলিয়া তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। যে সময় হইতে নারীদেহে অধিক পরিমাণে আর্ত্তব সংগৃহীত হয় এবং মাসে মাসে তাহা নির্গত হইয়া যায়, সেই সময়ে দৈহিক উপাদান অতিরিক্ত রূপে উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়াই তখন দেহ বৃদ্ধির ব্যাঘাত জন্মায়ন। এইজন্য যৌবনকাল উপস্থিত হইলে আর শৈশবের ন্যায় কাহারও দেহ বৃদ্ধি হয় না। পুরুষের দেহ-বৃদ্ধি সম্বন্ধেও এই নিয়ম জানিবে। তবে শৈশব-

কালেও যে পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীলোকের আর্ত্তব না জন্মে, এমন নয়; কিন্তু অত্যন্ত অল্পতা প্রযুক্ত অথবা শরীর হইতে একেবারে নির্গত হইয়া যায় না বলিয়া তাহাতে পুষ্টিকারক পদার্থোৎপাদনে কোন প্রতিবন্ধক জন্মায় না, সুতরাং অনায়াসে ক্রমশঃ দেহ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

পার্ব্বা নাথ! রমণীগণ গর্ভবতী হইলে প্রায়ই তাহাদিগকে পীনোন্নত-পয়ধরা ও সুপুষ্টা হইতে দেখা যায়, কিন্তু সন্তান প্রসব হইলে কিছু দিন পরে আর সেরূপ থাকে না, ইহার কারণ কি?

মহা। গর্ভবতী নারীর আর্ত্তববাহী পথ সকল অবরুদ্ধ হয়, সুতরাং সেই সময় তাহারা রজঃস্বলা হইতে পারে না। সেই সকল আর্ত্তব কাল-সহকারে ঊর্দ্ধগামী হইয়া প্রথমতঃ গর্ভের আবরণ রূপে পরিণত হয় এবং পরে আরও ঊর্দ্ধগামী হইয়া স্তনদ্বয় পর্য্যন্ত ধাবিত হয়, তাহাতেই স্তনদ্বয় আয়ত ও পীনোন্নত হইয়া থাকে। ঐ সকল শুষ্ক আর্ত্তব আরও ঊর্দ্ধে উঠিলে অক্ষিপুট অপেক্ষাকৃত স্থূল ও মুখশ্রীর সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য হইয়া পড়ে।

পার্ব্ব। কি প্রকার আর্ত্তব সম্পূর্ণরূপ নির্দ্দোষ এবং গর্ভগ্রহণের পক্ষে একান্ত হিতকর?

মহা। যাহা লাক্ষা-জল বা শশকরক্তের ন্যায়,

ঈষৎ বিবর্ণ, যাহা কাপড়ে লাগিলে ধুইবামাত্রই অমনি উঠিয়া যায়, কিছুমাত্র দাগ থাকে না, তাহাই বিশুদ্ধ এবং তাহাতেই গর্ভ গ্রহীত হয়। ইহার অন্যথা হইলে আর্ত্তবকে দোষযুক্ত বলিয়া জানিবে এবং তাহা হইতে কখনও গর্ভ সঞ্জাত হয় না!

পার্ব্ব। এই মাত্র যে শুক্রের কথা কহিলে, সেই শুক্রের সাধারণ গুণ কি? এবং কি প্রকার অবস্থাপন্ন হইলেই বা তাহার গর্ভোৎপাদিকা শক্তি বজায় থাকে?

মহা। শুক্র সৌম্য, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, বল এবং পুষ্টিকারক। উহাই গর্ভের বীজ, শরীরের সার এবং জীবনের প্রধান আশ্রয়। দেহস্থ শুক্রের ক্ষয় হইলে দেহী কখনও জীবন ধারণ করিতে পারে না। যে শুক্রের বর্ণ স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল, যাহা দ্রব, স্নিগ্ধ, মধুর এবং মধুগন্ধি, তাহাতেই গর্ভোৎপত্তি হইয়া থাকে।

পার্ব্ব। এই শুক্র কোথায় অবস্থিতি করে? এবং কি প্রকারেই বা স্খলিত হইয়া জরায়ু মধ্যে বিশ্ব-বিমুগ্ধকর অপূর্ব্ব কারু-নৈপুণ্য প্রকাশ করে?

মহা। পূর্ব্বেই কহিয়াছি, শরীরস্থ ভুক্ত বস্তু বারম্বার পচ্যমান হইয়া যথাক্রমে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি এবং মজ্জারূপে পরিণত হয়। ইহার প্রত্যেক বারেই কিছু কিছু করিয়া মলভাগ অবশিষ্ট থাকে এবং

উহা সমশ্রেণী ধাতু সকলকে ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্ট করিয়া যথাক্রমে বিষ্ঠা, মূত্র, ঘর্ম্ম, কর্ণমল এবং নখ কেশাদি রূপে বহির্ভাগে নিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। পরে মজ্জা হইতে উদ্ধৃত সারাংশ ও পূর্ব্ববৎ পাচিত হইয়া শুক্রস্থানে উপস্থিত হয় এবং শুক্রধাতুকে যথোচিত পরিপোষণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদায় শরীরস্থ ত্বকের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাই শুক্রের অবস্থিতির স্থান। যে প্রকার দুগ্ধে ঘৃত এবং ইক্ষুদণ্ডে রস নিয়ত ব্যাপ্ত থাকে, কিঞ্চিৎ পীড়ন করিলেই তাহারা বাহির হইয়া পড়ে; তদ্রূপ কাম-মদে প্রমত্ত পুরুষ মদোন্মত্তা প্রমদাগণের সহিত উপগত হইবার সময় তাহাদিগের যোনি-মেঢ্র সংঘর্ষণে যে তাপোদয় হইয়া থাকে, সেই তাপ দ্বারা পুরুষের দেহস্থ শুক্র একটু একটু করিয়া দ্রবীভূত হয় এবং ধরাধরস্থিত নির্ঝরের ন্যায় ঝর্ ঝর্ শব্দে মেহনমার্গ দ্বারা প্রবলবেগে নারীর ভগে পতিত হয়। সেই শুক্র আগত আর্ত্তবের সহিত মিশ্রিত হইলে পরিশেষে গর্ভাকারে পরিণত হইয়া থাকে।

পার্ব্ব। এইক্ষণে জরায়ু-মধ্যে যে প্রকারে জীব সঞ্চার হয়, তাহাই বিশেষ করিয়া শুনিতে পারিলে আমার বাসনা চরিতার্থ হয়।

মহা। যে দিন হইতে রমণাদিগের প্রথম রজঃ

নিঃসৃত হইতে আরম্ভ হয়, সেই দিন হইতে ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত যে কাল, সেই কালকেই তাহাদিগের ঋতুকাল কহে। ইহাই গর্ভগ্রহণের প্রকৃত সময়। এই সময় কামিনীগণের কাম-প্রবৃত্তি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং পতি-সহবাসের বাসনা নিতান্ত বলবতী হয়। দিবাকর-করে কমলিনী দল যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে এবং নিশাগমে আবার অধোবদনে একবারে মলিনা হইয়া যায়, সেইরূপ ঋতুকাল উপস্থিত হইলে রমণীদিগের জরায়ুর মুখ খুলিয়া যায় এবং উহা ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত ঐরূপ থাকিয়া শেষে আবার মুদিত হয়। সুতরাং ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে স্ত্রী সম্ভোগ করিলে তাহাতে কখনও সন্তানোৎপত্তি হইতে পারে না। তবে ব্যাধি-পীড়িতা রমণীদিগের সম্বন্ধে নিয়মিত রূপে কিছুই সম্পন্ন হয় না। কাহারও বা জরায়ুর মুখ দুই এক দিন বেশীও অল্‌গা থাকে, আবার কাহারও বা দুই এক দিন পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়া যায়! এমন কি, কোন কোন স্ত্রীলোককে আবার মাসের মধ্যে দুইবার করিয়াও ঋতুমতী হইতে দেখা যায়। এই সকল স্ত্রী-লোকদিগের শরীরে কোন পীড়ার বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ না পাইলেও ইহাদিগকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলিয়া মনে করা কখনও উচিত নহে। বিনা কারণে কেহ মাসের মধ্যে দুইবার করিয়া ঋতুমতী হইতে পারে না।

এরূপ অবস্থায় যদি কাহারও দৈবাৎ গর্ভ গ্রহীত হয়, তবে সেই গর্ভকে বিকৃত গর্ভ বলিয়া স্থির করাই উচিত। আবার বিবেচনা করিয়া দেখিলে রজঃ নিঃসরণের প্রথম তিন দিনও স্ত্রী সহবাস বর্জ্জন করা উচিত। কেননা এই সময় রমণীদিগের অত্যন্ত শোণিতস্রাব হইয়া থাকে, সুতরাং নিষিক্ত বীর্য্য স্রোতপথে পতিত হইয়া ভাসিয়া যায়। তাহাতে কখনও গর্ভ গ্রহীত হইতে পারে না। লাভের মধ্যে কেবল স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই নানা প্রকার গুরুতর পীড়া জন্মে। চতুর্থ দিনে ঋতুবতী নারী অঙ্গাদি মার্জ্জন করিয়া স্নান করিবে এবং শোণিত স্রাব বন্ধ হইলে উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া স্বামীর নিকট গমন করিবে। তখন উভয়ে হৃষ্ট-চিত্তে অপত্যার্থী হইয়া পরস্পর সুরতরূপ ব্যায়ামে নিযুক্ত হইবে। এইরূপ করিলে হর্ষবশতঃ পুরুষের দেহ হইতে নির্দ্দোষ বীর্য্য স্খলিত হইয়া সবেগে রমণীর জরায়ু মধ্যে পতিত হয়, কিছুকাল পরে আবার তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া জরায়ু-পার্শ্বস্থিত ডিম্বাশয়ে আশ্রয় লয়, এবং গর্ভগ্রহণোপযোগী উপাদানের সহিত মিশ্রিত হইয়া পুনর্ব্বার জরায়ুমধ্যে অবস্থিতি করে। যে প্রকার সূর্য্য-কিরণ-সংযোগে সূর্য্যকান্ত মণি হইতে অগ্ন্যুদ্গম হয়, অথচ কেহই তাহার কোন কারণ উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ নির্দ্দোষ শুক্র

জরায়ু মধ্যস্থিত নির্দ্দোষ আর্ত্তবের সহিত মিশ্রিত হইয়া গর্ভ মধ্যে জীব সঞ্চার করে। প্রতিনিয়ত পরিদর্শন করিয়াও কেহ ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে না। অর্থাৎ সেই অব্যক্ত, অনন্ত, বাক্য ও মনের অতীত একরূপী আত্মা জগতের হিতের জন্য মায়াময় হইয়া কি প্রকারে যে গর্ভমধ্যে প্রবেশ করে; অল্পদর্শী স্থূলবুদ্ধি মানব তাহার বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারে না। এইরূপে গ্রহীত গর্ভ (জীব) প্রতিদিন একটু একটু করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া, হৃদয়, ফুস্ফুস, যকৃৎ, প্লীহা, পিত্তাশয়, পক্কাশয় প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রগুলি, যথানিয়মে পরিপুষ্ট করিয়া এবং মাতৃদেহস্থিত সেই সেই যন্ত্রগুলি যে নিয়মে কার্য্য করে ও চালিত হয়, সেই নিয়মে কার্য্য করিবার ও প্রতিচালিত হইবার ক্ষমতা লাভ করিয়া কাল সহকারে ভূমিষ্ঠ হয়। কোমল বস্তু-মাত্রই যে ছাঁচে ঢালা যায় সেই অনুসারে তাহার আকৃতি হইয়া থাকে, এই জন্যই মাতার আকৃতির সহিত সন্তানের আকৃতির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আবার গর্ভ-গ্রহণোপযোগী শুক্রের মধ্যে জীবোৎপাদক যে পদার্থ আছে, তাহার সহিত পিতার সাদৃশ্যতাবশতঃই সন্তানও পিতার ন্যায় হইয়া থাকে। অথবা পিতা মাতা উভয়ের মিশ্রিত আকৃতির ন্যায়ও সন্তানের আকৃতি হইতে পারে।

পার্ব্বা। গর্ভোৎপত্তি হইল কি না, সঙ্গমকালে তাহা জানিবার কি কোন উপায় আছে ?

মহা। শুক্র শোণিতে যোনির আর্দ্রতা ও স্ফূর্ত্তি, সম্ভোগরতা রমণীর শ্রমোদ্ভব, সক্‌থিসাদ, পিপাসা ও গ্লানি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নিশ্চয়ই গর্ভ হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে। আবার দ্বিতীয় মাস অতীত হইলে গর্ভিণীর স্তনদ্বয়ের মুখ কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষুর পক্ষ সম্মিলন, রোমসমূহের উদ্‌গম, আহারে অনিচ্ছা বা বমন ও শুভ গন্ধে উদ্বেগ উপস্থিত হইয়া থাকে।

পার্ব্বা। ভাল, হৃদয়-বল্লভ! যে রমণী একবার পুত্র প্রসব করে, সেই আবার সময়ান্তরে কন্যা প্রসব করে কেন? পুত্রবতী গর্ভিণীরই বা লক্ষণ কি? এবং গর্ভে কন্যা থাকিলেই বা তাহা কিরূপে জানা যায় ?

মহা। প্রকৃতিবশে সম্ভোগকালে শুক্রের পরিমাণ অধিক হইলে পুত্র এবং শোণিতের পরিমাণ অধিক হইলে কন্যা জন্মে। যুগ্মরাত্রিতে রমণীদিগের স্বভাবতঃই কিঞ্চিৎ শোণিতের অল্পতা ঘটিয়া থাকে, সুতরাং যুগ্ম-রাত্রিতে গর্ভ হইলে শুক্রাধিক্যবশতঃ তাহাতে পুত্র হয়। আবার অযুগ্মরাত্রিতে গর্ভগ্রহণোপযোগী শোণিতের পরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক হয় বলিয়া ঐ দিনে কন্যা জন্মে। একই রমণীর বারম্বার পুত্র কন্যা হইবার ইহাই একমাত্র কারণ। গর্ভে পুত্র হইলে দ্বিতীয় মাসে গর্ভিণীর উদরে

এক প্রকার পিণ্ডাকার পদার্থ অনুভূত হয়; দক্ষিণ চক্ষু বৃহৎ, দক্ষিণ উরু সুপুষ্ট ও মুখের বর্ণ সুপ্রসন্ন হয়; অগ্রে দক্ষিণ স্তনে দুগ্ধ জন্মে এবং স্বপ্নেতেও প্রায়শঃ পুত্রাভিলাষ হয় বা আম্র পদ্মাদি পাওয়া যায়। কন্যাবতী গর্ভিণীর দ্বিতীয় মাসে পেশী কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকৃতি হয়, অগ্রে বাম স্তনে দুগ্ধ জন্মে, বামচক্ষু বৃহৎ ও বাম উরু পুষ্ট হয় এবং মুখের বর্ণও ততো প্রসন্ন হয় না।

পার্ব্বতী। আবার নপুংসক নামে যে একপ্রকার না পুরুষ না মেয়ে জাতীয় সন্তান হইতে দেয়া যায়, তাহার কারণ কি? এবং সেই গর্ভিণীর বাহ্যলক্ষণই বা কিরূপ হইয়া থাকে?

মহা। সম্ভোগকালে যদি ভাগ্যক্রমে শুক্রশোণিতের সমতা ঘটিয়া উঠে, তবে তাহাতেই নপুংসকের উৎপত্তি হয়। এতৎ সম্বন্ধে আরও অনেক রহস্য আছে, তৎসমুদায় উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। নারীর গর্ভে নপুংসক জন্মিলে গর্ভ অর্ব্বুদাকৃতি (অর্থাৎ গোলাকার ফলের অর্দ্ধাংশ) হয়, উদরের পার্শ্বদ্বয় উন্নত ও সম্মুখভাগ বৃহৎ হইয়া পড়ে।

পার্ব্বতী। হে সুরাসুর-সেবিত শঙ্কর! এক্ষণে যমজ সন্তানের উৎপত্তি-বিষয় কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলেই অধিনীর বাসনা পূর্ণ হয়।

মহা। তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। এইমাত্র যেরূপ উক্ত হইল, সেইরূপ পুরুষের বীর্য্য গর্ভাশয়ে যাইয়া ঘন হইবার পূর্ব্বেই যদি অন্তর্ব্বায়ুদ্বারা দুই অংশে বিভক্ত হয় এবং গর্ভধারণোপযোগী উপকরণের সহিত অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া আর একত্রিত হইতে না পারে, তবে তাহাতেই এক গর্ভে দুইটী সন্তানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাতেও কোন কারণে পূর্ব্বের ন্যায় শুক্রশোণিতের তারতম্য হইলে একটী পুত্র একটী কন্যা হইতে পারে। কেবল যমজ বলিয়া কোন কথা নাই, নিষিক্তবীর্য্য যত অংশে বিভক্ত হয়, একগর্ভে ততটী সন্তানই হইতে পারে। কিন্তু তাহারা কখনও বাঁচিয়া থাকে না। দৈবঘটনায় যদিও কখনও কখনও বাঁচে, কিন্তু তাহাহইলে প্রসবকালে প্রসূতিকে বড়ই সঙ্কটে পড়িতে হয়। ভূমিষ্ঠ হইতে বা ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরেই সন্তানগুলি মরিয়া যায়। স্থানের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ তাহাদের সমুদায় অঙ্গ পূর্ণ হইতে পারে না বলিয়াই এরূপ হয়। আবার দুর্ব্বল প্রকৃতির যমজ সন্তানও প্রায় বাঁচিতে দেখা যায় না।

পার্ব্ব। আচ্ছা, গর্ভমধ্যে সন্তান কি প্রকার অবস্থায় অবস্থিতি করে? এবং প্রসব হইবার সময়ই বা কিরূপ হইয়া থাকে?

মহা। কুক্ষিমধ্যে সন্তান সাধারণতঃ ঊর্দ্ধশির

হইয়া অবস্থিতি করে এবং সেই ভাবেই দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া মাতৃদেহ হইতে দেহধারণোপযোগী পদার্থ ও ইন্দ্রিয়াদি সংগ্রহ করিয়া লয়। অষ্টম মাস উপস্থিত হইলে সন্তান গর্ভমধ্যে তীর্য্যক্‌ভাবে অবস্থিতি করে। পরে নবম বা দশম মাসে অধোমুখী হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে দূষিত গর্ভ বলিয়া জানিবে।

পার্ব্ব। তবে যমজ সন্তানও কি ঠিক এই নিয়মেই অবস্থিতি করে এবং ভূমিষ্ঠ হয ?

মহা। না, যমজসন্তান সম্বন্ধে একটু পার্থক্য আছে। এক গর্ভে দুইটী সন্তান হইলে তাহারা পরস্পর বিপর্য্যস্ত ভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া কালসহকারে ভূমিষ্ঠ হয়। অর্থাৎ একজনের মস্তক অপর জনের পদদ্বয় একদিকে থাকে। কিন্তু উভয়ের নাভিস্থান কখনও বিপরীত ভাবে অবস্থিতি করে না। এইরূপে প্রসবের কাল আসন্ন হইলে যখন মুহুর্মুহুঃ বেদনায় প্রসূতি একবারে অস্থির হইয়া পড়ে, তখন জরায়ুর মুখ আল্‌গা হইয়া যায় এবং অধোশির সন্তানটী প্রথমে ভূতলে পতিত হয়। অনন্তর দ্বিতীয়টীও আবার সেই পথে ঘুরিতে ঘুরিতে অধোমুখী হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যেই দুরতিক্রম্য জঠর যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। কিন্তু প্রসূতির দেহাভ্যন্তরীণ বাতাদির প্রভাববশতঃ কাহারো কাহারো একটী প্রসব

হইলেও অপরটী প্রসব হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়া থাকে। প্রসূতি খালাস হইবার পব ফুল পড়িয়াগেলে পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে তাহাদের সুশ্রূষা করিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

একদা বিশ্বজননী ভবানী জীবন-সহচরী জয়া-বিজয়া-সহিত বিচিত্র কদম্ব-কাননে বিচরণ করিতেছিলেন*। ভূলোক, দ্যুলোক প্রভৃতি বিশাল গোলকের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে সহসা বিজয়া কহিলেন, মাতঃ! সৃষ্টি সৃষ্টি করিয়া তোমাকেই যে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতে দেখি। যোগেশ্বর কৈলাস-নাথ ত কখনও কিছুতে লিপ্ত হয়েন না! তবে কি তাঁহার অপেক্ষা তোমারই যোগ্যতা অধিক? আর যদি তাহাই হয়,

---

* যে দিকে মহামায়ার আবির্ভাব, সেই দিকের জয়ও অবশ্যম্ভাবী, তাই জয়া বিজয়া তাঁহার চিরসহচরী।

প্রাচীন ঋষিগণ বড়ই অলঙ্কার-শাস্ত্রের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহাদিগের রচিত নানাবিধ শাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণাদিতে রূপক অলঙ্কারের বড়ই ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল রূপকের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া বর্ত্তমান ম্লেচ্ছভাষাজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রকৃত শাস্ত্রকে সময় সময় একবারে অশাস্ত্ররূপে পরিণত করেন। ভগবান বশিষ্ঠ শ্যামা-কবচের ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া একস্থলে বলিয়াছেন—"কদম্ব-বন-সঞ্চারা কদম্ববন-বাসিনী। কদম্ব-পুষ্প-সন্তোষা কদম্ব-পুষ্প-মালিনী॥" অর্থাৎ নিখিল জগতের আধার যে একমাত্র আকাশ, তাহাকে তিনি কদম্ব-বৃক্ষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতি-রূপিণী মহাদেবী সেই কদম্ববনে বিচরণ করিয়া বেড়ান। ফলতঃ নিশাকালে নভোমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলে চতুর্দ্দিক্ হইতে যখন অসংখ্য অসংখ্য

নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে প্রথমে তলপেটে তীব্র বেদনা ও রক্তস্রাব হইতে আরম্ভ হয়। ইহার প্রতীকারের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আবার উচিত প্রসবকালে রীতিমত প্রসব না হইলে সেই গর্ভকে মূঢ় গর্ভ কহে। অত্যাচার দ্বারা কুপিতবায়ু দিন দিন প্রবল হইয়া যোনি জঠরাদিতে শূল এবং মূত্রবদ্ধতা জন্মাইয়া মূঢ়গর্ভ উৎপাদন করে।

পার্ব্ব। সেই মূঢ়গর্ভ কত প্রকার? এবং প্রত্যেকের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণই বা কি?

মহা। প্রিয়ে! বিগুণীকৃত বায়ুদ্বারা গর্ভস্থ সন্তান নানাপ্রকার কুটিল গতিতে যোনিমুখে সমাগত হইয়া থাকে। তাহার এমন কোন সংখ্যা বা নিয়ম নাই যে সন্তান ঠিক সেই প্রকারেই প্রসব-দ্বারে উপস্থিত হইবে। অথবা তাহার এমন কোনও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বা নিয়ম হইতেও পারে না। তবে প্রসবের সময় যে কয়েকপ্রকার অবস্থা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে তাহাই উল্লেখ করিতেছি, যথা—

১। সন্তান মস্তক দ্বারা যোনিদ্বারকে আচ্ছাদন করিয়া উহাতে সংলগ্ন থাকিলে অর্থাৎ কোন মতেই অগ্রসর হইতে না পারিলে সেই গর্ভকে বিপুলমস্তক কহে।

২। সন্তান কখনো কখনো মস্তকের পরিবর্ত্তে

জঠর দ্বারা যোনিমুখে অবরুদ্ধ হয়, তাহাকে জঠরাবরোধক কহে।

৩। কখনও সন্তানের শরীর পরিবর্ত্তিত হইয়া পৃষ্ঠদ্বারা যোনি প্রবেশ করে, তাহাকে পৃষ্ঠাবরোধক কহা যায়।

৪। সন্তান তীর্য্যগ্‌ভাবে অপত্য-পথে পতিত হইলে তাহাকে তীর্য্যগ্‌পার্শ্ব কহে।

৫। আবার পার্শ্বভঙ্গসেতু দেহ পার্শ্বে নত হইয়া রুদ্ধগতি হইলে তাহাকে বিপুল তার্য্যগ্‌পার্শ্ব কহে।

৬। কখনো শিশুর একটী বা দুইটী হস্তই আগে বাহির হইয়া মস্তক বক্রভাবে পড়ে, তাহাকে মুণ্ড বিঘাতক কহা যায়।

৭। কোন শিশু অবাঙ্মুখ হইয়া অর্থাৎ মস্তকের পরিবর্ত্তে মুখমণ্ডল দ্বারা অগ্রসর হইয়া থাকে, ইহাকে বিপুলমুখাবরোধক কহা যায়।

৮। গর্ভস্থ সন্তানের মস্তক হস্ত এবং পদদ্বয় একত্রে যোনিতে প্রবেশ করিয়া কীলের ন্যায় রুদ্ধ হইলে তাহাকে সংকীলক মূঢ়গর্ভ কহে।

৯। প্রতিখুর মূঢ়গর্ভে প্রথমতঃ শিশুর পদদ্বয় যোনিতে প্রবেশ করে।

১০। বীজক মূঢ়গর্ভে মস্তকের সহিত একটী বা দুইটী হস্তই প্রসব-দ্বারে সমাগত হয়।

১১। এতদ্ভিন্ন আরও একপ্রকার মূঢ়গর্ভ আছে, তাহাতে সন্তান যোনিমধ্যে দ্বারের অর্গলের ন্যায় অনুপ্রস্থ অর্থাৎ আড়ভাবে অবস্থিতি করিয়া প্রসূতিকে নিতান্ত বিপদগ্রস্ত করিয়া ফেলে।

এই যে কয়েকটী অবস্থার কথা বলা হইল, মোটা মোটী ধরিয়া দেখিলে ইহার সমস্তগুলিই কৃচ্ছ্র সাধ্য। তন্মধ্যে আবার সন্তানের মস্তকের সহিত পদদ্বয় যোনি-মুখে সমাগত হইলে, অথবা একখানি পদ প্রসূতির গুহ্যদেশে আবদ্ধ থাকিয়া অপরখানি যোনি দ্বারে প্রবেশ করিলে তাহা অসাধ্য বলিয়া জানিবে। অসাধ্য মূঢ় গর্ভে প্রসূতির ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অভাব, আক্ষেপ, প্রসব দ্বার-রোধ, বঙ্ক্ষণ দ্বয়ের অবিরত কম্পন, শ্বাস, কাস এবং ভ্রম প্রভৃতি লক্ষণ যুগপৎ উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রসূতির এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইলে দয়া মায়া বিসর্জ্জন দিয়া নিতান্ত মূঢ়ের ন্যায় গর্ভভেদ করিলে সজীব সন্তান বাহির করা যাইতে পারে।

এই কথা শুনিয়া পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! আমি অবলা হইয়া অবলাদিগের এই নিদারুণ শোচনীয় অবস্থার কথা আর শুনিতে চাই না। এইক্ষণ যে যে উপায় অবলম্বন করিলে সরলা কুলবালাগণ এই আসন্ন বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পায়, তাহাই যথোচিত কীর্ত্তন করিয়া আমার শান্তিসাধন ও প্রজাগণের মঙ্গল বিধান করুন।

তচ্ছ্রবণে মহাদেব কহিলেন, প্রসবকালে গর্ভস্থ সন্তান কোন প্রকার বিকৃতভাবে যোনিমুখে সমাগত হইলে প্রথমে তাহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। যে ভাবে সন্তান অবরুদ্ধ থাকে, তাহা বেশ বুঝিয়া পেটের উপর হাত বুলাইয়া যদি সোজা করিয়া দেওয়া যায়, তবে তাহাই দিবে। নতুবা যন্ত্রদ্বারাই হউক, অথবা ঘৃতসিক্ত হাত প্রবেশ করিয়াই হউক, ঘাত প্রত্যাঘাতে সন্তানকে সোজা করিয়া দিতে চেষ্টা করিবে। কেবল এই উপায়ে সোজা করিয়া দিলেই যে সকল সময় উপকার হইবে এমন কোন কথা নাই। জঠরস্থ বায়ু পূর্ব্ববৎ কুপিত থাকিলে তদ্দ্বারা সন্তান আবার সেইভাবে বা অন্যভাবেও পড়িতে পারে। তাহাতে কখনও বা ভাল হয়, আবার কখনও বা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। অতএব যাহাতে গর্ভস্থ বায়ু সাম্যভাবে অবস্থিতি করে, প্রথমে তাহাই করিবে। এরূপ অবস্থায় প্রথমে স্বল্প বিষ্ণু-তৈল মর্দ্দন করিবে, তাহাতে উপকার না হইলে মধ্যবিষ্ণু তৈল প্রয়োগ করিবে। ইহাতে জঠরস্থ বায়ু প্রকৃতিস্থ হইয়া অচিরে প্রসবব্যাঘাত দূর করে। কেহ কেহ আবার এই সকল তৈলের পীচকারী দ্বারাও কার্য্য সিদ্ধি করিয়া থাকেন। অনন্তর প্রসব-বাধা দূর করিবার জন্য যে সকল ঔষধের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহারই মধ্যে বিবেচনা

করিয়া প্রসূতির অবস্থানুসারে যাহা ভাল বলিয়া বোধ হইবে, তাহাই প্রয়োগ করিবে। এইরূপ অবস্থায় হিতকর আরও গুটিকয়েক ঔষধের কথা বলা যাইতেছে। পুঁই শাকের মূল তিলতৈলের সহিত পেষণ করিয়া যোনির অভ্যন্তরে প্রলেপ দিবে। ইহাতে প্রসব-বাধা দূর হয়। প্রথমে পিপুল ও বচ সমভাগে জলের সহিত বেশ করিয়া বাঁটিয়া লইবে। পরে তাহার সহিত ভেরে-ণ্ডার তৈল মিশাইয়া নাভি দেশে প্রলেপ দিবে। ইহাতে বহুতর দোষকর্তৃক পীড়িতা নারীও অনায়াসে প্রসব করে।

পার্ব্বি। এই যে আবার যন্ত্র-প্রয়োগের কথা কহিলে, সেই যন্ত্রই বা কিরূপ? এবং কিরূপ অবস্থায় কেমন করিয়াই বা তাহা প্রয়োগ করিতে হয়?

মহা। প্রিয়ে! মূঢ়গর্ভ প্রতীকারের জন্য অনেক প্রকার যন্ত্র প্রয়োগের নিয়ম আছে। তন্মধ্যে ছয়প্রকার যন্ত্রই সমধিক প্রচলিত। তাহাদিগকে শঙ্কুযন্ত্র কহে। ১২ ও ১৩ অঙ্গুলি পরিমিত ফণীফণার ন্যায় দুই প্রকার শঙ্কু আছে; তদ্দ্বারা যোনিমুখ প্রসারিত হয় এবং সন্তান যে ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, তাহাও বিলক্ষণ জানিতে পারা যায়। ইহা যোনি মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে সন্তান অনায়াসে ভূমিষ্ঠ হইতে পারে। আবার শর-পুঙ্খের ন্যায় দুই প্রকার শঙ্কু আছে, গর্ভস্থ সন্তান

বিকল অবস্থায় সমাগত হইলে তদ্দারা তাহা সোজা করিয়া দেওয়া যায়। ইহা চালন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ভিন্ন আরও দুই প্রকার শঙ্কু আহরণ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে গর্ভশঙ্কু ও যৌগ্ম-শঙ্কু কহে*। গর্ভশঙ্কু দীর্ঘে প্রায় ৮ অঙ্গুলী পরিমিত। ইহার অগ্রভাগ বড়িশের ন্যায় বক্র। তদ্দারা গর্ভস্থ সন্তানকে আকর্ষণ করিয়া বাহির করিতে হয়। সজীব সন্তান বাহির করিতে হইলে গর্ভশঙ্কু অপেক্ষা যৌগ্ম শঙ্কুই সচরাচর ব্যবহার করা যায়। ইহা দ্বারা যোনি-মুখ কিঞ্চিৎ প্রসারিত হয় বলিয়া সহজেই সন্তান আকৃষ্ট

---

* পাঠকদিগের বিশ্বাসার্থ নিম্নে কয়েকটী সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে, যথা—

শঙ্কবঃ ষড়্ভিস্তেষাং ষোড়শ দ্বাদশাঙ্গুলৌ।
ব্যূহনেঽহিফণা বক্ত্রৌ দ্বৌ দ্বাদশ দশাঙ্গুলৌ॥
চালনে শরপুঙ্খাস্যা বাহার্য্যো বড়িশাকৃতী।
নতোঽগ্রে শঙ্কুনা তুল্যো গর্ভশঙ্কুরিতি স্মৃতঃ।
অষ্টাঙ্গুলায়ত স্তেন মূঢ়গর্ভং হরেৎ স্ত্রিয়াঃ॥
সংবদ্ধ শঙ্কু যুগলো যৌগ্মশঙ্কুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মূঢ় গর্ভাহৃতৌ সোঽপি প্রযোজ্য গর্ভশঙ্কুকঃ॥

এই সকল বচনদ্বারা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে, পূর্ব্বকালেও হতভাগ্য ভারতরাজ্যে এই সমুদায় বিষয়ে গভীর আলোচনা হইত, এবং হ্যাট্‌কোট্‌-বর্জ্জিত অসভ্য আর্য্যসন্তানদিগের ক্ষীণমস্তিষ্ক হইতেও নানাপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তবে কালের কুটিল স্রোতে সেই সমুদায় ভাসিয়া গিয়াছে, অথবা পরপদস্খলিত ধূলিরাশি স্তরে স্তরে সজ্জিত হইতে হইতে

হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। এই যন্ত্র দেখিতে বেড়ীর ন্যায়। যন্ত্রদ্বারা সন্তান প্রসব করাইবার সমুদায় কৌশল কখনও বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। উপযুক্ত সময় দৃষ্টান্ত দ্বারা সুন্দররূপে বুঝাইয়া না দিলে কেহই এ বিষয়ে সিদ্ধ জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না। যিনি অনেকবার স্বচক্ষে প্রসব করাইতে দেখিয়াছেন, তিনি ব্যতীত অজ্ঞ

ভারতের রত্নরাশি আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। বহুকাল হইতে বৈদেশিক শিক্ষায় আমাদিগের প্রকৃতি আজকাল এমনভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, আমরা ভ্রমেও একবার নিজ গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করি না। কেবল পর গৃহে প্রবেশ করিবার জন্যই দিবারাত্রি যত্ন করিয়া থাকি। সুতরাং নিজ গৃহস্থিত অকৃত্রিম রত্নরাশি উপেক্ষা করিয়া পরগৃহস্থিত বা শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যমধ্যস্থিত কৃত্রিম বস্তু সংগ্রহ করিবার জন্য যে লালায়িত হইব, তাহাতে আর বিচিত্র কি বলিতে কি, যদি নব্য বাবুদিগের কাহাকেও নিজ পিতামহের নাম জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে অমনি অবাক্ হইয়া পড়েন, কিন্তু কোথায় সাত সমুদ্র তের নদী পারে কোন্ সামান্য দ্বীপে কতটী রাজপুরুষ কোন সময় সিংহাসন উজ্জ্বল করিয়া বসিলেন, কাহার কতটী পুত্রকন্যা হইল, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বলিয়া দিতে পারেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে এই শ্রেণীর লোকেরাই আবার "ভারতের কিছুই নাই, যাহা কিছু উন্নতির জিনিষ——যাহা কিছু বিজ্ঞানমূলক, তাহা ইউরোপ হইতেই হইয়াছে" ইত্যাদি বলিয়া সর্ব্বদা অহঙ্কার করিয়া থাকেন। ভাল, নিজের যাহা আছে না আছে, তাহা একবার জানিয়া পরে এই কথা বলিলেও কতক শোভা পায়। এস্থলে আর একটী ঘটনার কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইতিমধ্যে বহুকাল পরে আমার একজন পরমবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতে উভয়ে একত্রে বাস, একত্রে ভোজন এবং একই বিদ্যালয়ে একসঙ্গে ইংরাজী প্রবেশিকা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করায় আমাদের মধ্যে বিলক্ষণ সখ্যতা জন্মিয়াছিল। এইক্ষণ তিনি বিশ্ববিদ্যা-

বা হীন-সাহস ব্যক্তির পক্ষে যন্ত্রাদিতে হস্তার্পণ করা বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

পার্ব্ব। গর্ভমধ্যে সন্তানের মৃত্যু হইলেই বা তাহা কিরূপে জানা যায়?

মহা। গর্ভে সন্তানের মৃত্যু হইলে সেই গর্ভ কখনও স্পন্দিত হয় না, এবং প্রসববেদনার ও ক্রমে ক্রমে লাঘব হইয়া থাকে। গর্ভিণীর নাসিকা হইতে সর্ব্বদা দুর্গন্ধ বাহির, তাহার অঙ্গে শোথ এবং শরীর শ্যাব বা পাণ্ডু-বর্ণ হইয়া যায়।

পার্ব্ব। আচ্ছা, যে গর্ভিণী কিছুতেই বাঁচিবে না, তাহারই বা অবস্থা কিরূপ হইয়া থাকে?

লয়ের বি, এ, উপাধি লাভ করিযাছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্ব আচার ব্যবহার সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইযাছে। একদিন কথাপ্রসঙ্গে দেশীয় এবং বৈদেশিক চিকিৎসা তত্ত্বসম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হওযায, তিনি বলিয়া ফেলিলেন যে, "আমি জানি, সংস্কৃত পড়িলেই লোকে দিন দিন কুসংস্কারাপন্ন হইয়া দাঁড়ায়। প্রাচীন অসভ্য হিন্দুদিগের কাল্পনিক কথার উপরই তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। এবং সভ্য ইউরোপীয়দিগের প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ জন্মিয়া উঠে। একদেশদর্শী বলিযাই তাহাদের এরূপ হয।" এই-ক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই, যাহারা বাল্যকাল হইতে নিয়ত বিদেশীয় সংসর্গে বাস করিয়া, বিদেশীয় ভাষায় দীক্ষিত হইয়া বিদেশের অনুকরণপ্রিয় হয়, অথচ দেশের কিছুই জানে না, তাহারাই একদেশদর্শী, না যাহারা নিজ দেশের বিষয়ও জানে এবং বিদেশের বিষযও জানিতে চেষ্টা করে, তাহারাই এক-দেশদর্শী! সুবিজ্ঞ পাঠকগণই তাহার মীমাংসা করিবেন।

মহা। যাহার অঙ্গ একবারে শীতল হইয়া যায়, এবং কিছুমাত্র লজ্জাবোধ থাকে না, যাহার নাড়ী ক্ষীণ ও কুক্ষির উপর নীলবর্ণ শিরাসকল উদ্গত হয়, তাহার প্রাণ এবং গর্ভ উভয়ই বিনষ্ট হয়। যে গর্ভিণী যোনি-সম্বরণ নামা রোগে আক্রান্তা—যে রোগের কথা পূর্ব্বে কেহই বুঝিতে পারে না, যাহার গর্ভ কুক্ষিতে শক্ত হইয়া থাকে ও মক্কল্প নামক রক্ত বাতশূলে মূহুর্মূহুঃ পীড়িত হয়, যাহার শ্বাস, আক্ষেপাদি উপদ্রবসমূহ যুগপৎ উপস্থিত হয়, সেই মূঢ়গর্ভা স্ত্রীর মৃত্যুই নিশ্চয়।

পার্ব্ব। ভাল, যোনি-সম্বরণ নামা এই যে আবার নূতন একটা বোগের কথা কহিলে, সেই বোগই বা কাহাকে বলে ?

মহা। যে রোগ দ্বারা গর্ভিণীব যোনিমার্গস্থিত বায়ু অত্যন্ত কুপিত হইয়া যোনিদ্বারকে সঙ্কুচিত করে এবং পুনর্ব্বার ভিতরে প্রবেশ করিয়া গর্ভাশয়ের মুখও অবরোধ করে, তাহাকেই যোনি-সম্বরণ রোগ কহে। বায়ুবৃদ্ধিকর অন্ন পানায়াদি, অতিশয় রাত্রি জাগরণ, অথবা মৈথুনাদিই ইহার একমাত্র নিদান। এই রোগে গর্ভ মুহুর্মূহুঃ প্রপীড়িত হয় এবং তদ্রূপাবস্থায় গর্ভিণীর কৃচ্ছ্র শ্বাস ও হৃদয়াবরোধ হইয়া হঠাৎ প্রাণত্যাগ হয়। এই রোগের কথা অথবা এইরূপ মৃত্যুর কথা পূর্ব্বে কেহই জানে না বা বুঝিতেও পারে না, সুতরাং গর্ভিণীকে

বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও সবল থাকিতে মরিতে দেখিয়া অজ্ঞ লোকেরা সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকে।

পার্ব্বা। হৃদয়-বল্লভ! এক্ষণে আরও একটী কথা শুনিবার জন্য আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। তুমি যে অসাধ্য মূঢ় গর্ভের কথা কহিলে, তাদৃশ অবস্থায় গর্ভিণীকে রক্ষা করিবার কি কোনই উপায় নাই? তবে কি হতভাগিনী দুঃসহ প্রসব-যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে ছট্ ফট্ করিয়া সংসার হইতে চলিয়া যাইবে? গর্ভ গ্রহণের পরিণাম ফল যদি ইহাই হয়, তবে ত নারীজন্ম না হওয়াই ভাল। পাপিয়সী গর্ভিণীদিগের প্রসব-যন্ত্রণার কথা শ্রবণ করিলে মনে হয়, তাহারা যেন কতই পাপের ফলে এই প্রকার দুর্দ্দমনীয় নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে!

মহা। প্রিয়তমে! সংসারে যত প্রকার মৃত্যু-নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার মধ্যে উপযুক্ত সময়ে সতর্ক হইলে কাল-মৃত্যু ভিন্ন আর সকল গুলি হইতেই মুক্তি লাভ করা যাইতে পারে। যখন দেখিবে গর্ভ নিতান্ত বিকৃতভাবে যোনি-মুখে আবদ্ধ রহিয়াছে এবং কিছুতেই নির্গত হইতে পারিতেছে না, অথচ প্রসবের বেগও বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং গর্ভকে যন্ত্র দ্বারা চালনা করিয়া সোজা করাও অসাধ্য, তখন প্রথমোক্ত শঙ্কু দ্বারা যোনি-মুখ যথাসম্ভব প্রসারিত করিয়া গর্ভশঙ্কুদ্বারা মূঢ়-

গর্ভকে আহরণ করিতে হইবে। যদি কোন স্থান বিশেষরূপে আবদ্ধ থাকে তবে শস্ত্রদ্বারা তাহা ছিন্ন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ অবস্থায় যদি প্রসূতির কোন স্থান ভেদ হয় বা সন্তানের নাভি-রজ্জু ছিঁড়িয়া যায়, তবে সমুদায় চেষ্টাই বিফল হইবে। প্রসূতিকে রক্ষা করিতে হইলে খুব সাবধানে এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। আবার সন্তান সজীব থাকিতে শস্ত্র প্রয়োগ করিলেও নানা প্রকার বিপদ হইতে পারে। অতএব শস্ত্র প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে সন্তান জীবিত আছে কি না তাহা বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।* শস্ত্রদ্বারা গর্ভস্থ সন্তানকে ভিন্ন করিয়া প্রসূতিকে খালাস করিলে প্রথমে উষ্ণ জল দ্বারা যোনি সেচন করিবে এবং পরিশেষে রোগিণীর শরীরে স্নেহ মাখাইয়া যোনি-মধ্যেও স্নেহ ধারণ করাইবে। তাহাতে বেদনার শান্তি হয় এবং পরেও কোন উৎকট পীড়া হইতে পারে না।

---

* পাঠকগণ মনে করিবেন না যে এই সকল কথা আমি নিজে বলিতেছি। যে সকল তেজঃপুঞ্জ সাক্ষাৎ ভগবানসদৃশ মহর্ষিগণ দিবানিশি এতদ্বিষয় আলোচনা করিয়া এক সময় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদিগেরই পরীক্ষালব্ধ, আমার কল্পনাসম্ভূত নহে। আমি কেবল পুনরুক্তি করিলাম মাত্র।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পার্ব্ব। ভাল, হৃদয়-বল্লভ! সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া গেলে কোন্ কোন্ কর্ম্ম প্রসূতির পক্ষে একান্ত হিতকর এবং সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যপ্রদ? সেই সকল কথাও এক্ষণে বিশেষ করিয়া শুনিতে ইচ্ছা করি।

মহা। প্রিয়ে! প্রসূতি খালাস হইলে যে প্রকারে নবকুমারের সুশ্রূষা করিতে হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার হিতজনক আহার বিহারের বিষয়ও কহিতেছি। প্রসূতি দিনের বেলায় খালাস হইলে সে দিন আর তাহাকে কিছুই খাইতে দিবে না। প্রসবের সময় আমাশয়, পক্বাশয় প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্র গুলি একটু ভাবান্তরিত হয়, সুতরাং পরিপাকশক্তিও অনেকটা হ্রাস হইয়া থাকে। সেই দুর্ব্বল অগ্নিতে কোন বস্তু পতিত হইলে তাহা সম্পূর্ণরূপ পরিপাক হইতে না পারিয়া প্রসূতির নানা প্রকার পীড়া জন্মায়। তবে পোয়াতী নিতান্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির হইলে বা সকাল বেলা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে পেয়াদি পান করিবার পূর্ব্বেই খালাস হইলে সুখ-পাচ্য মণ্ডাদি প্রস্তুত করিয়া দিবে। এইরূপে সে দিন অতীত হইলে পর দিন প্রথমে গুটি কয়েক মরিচ ও তৎপরিমিত শলুফ

(রান্ধনী জাতীয় সজ বিশেষ) একত্রে পেষণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। অথবা কৃষ্ণ-জীরা, মরিচ, রশুন ও শলুফ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া অন্নের সহিত খাইতে দিবে। ইহা বস্তি-শোধক ও বেদনানিবারক। উত্তম পুরাতন তণ্ডুলের সুসিদ্ধ অন্ন কেবল ঘৃত দ্বারাই ভোজন করিতে দিবে। এবং ক্রমাগত পাঁচ দিন পর্য্যন্ত এই ঘৃতান্ন ভোজন করিয়াই কুঁড়ে ঘরে থাকিতে হইবে। এতদ্দারা প্রসবজনিত দেহাভ্যন্তরীণ্ বিকৃত স্থান গুলি সত্বরেই দৃঢ় ও কার্য্যক্ষম হইয়া উঠে। আহারের প্রথমে মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বোক্ত শলুফ ও মরিচ সেবন করিলে উপকার ভিন্ন অপকারের সম্ভাবনা নাই। ষষ্ঠ দিন উপস্থিত হইলে আহার সম্বন্ধে প্রসূতি একটু স্বাধীনতা পাইতে পারে। সেই দিন অঙ্গ-শোধক, বায়ুসাম্যকারক, শ্লেষ্মাদোষনিবারক এবং সুখ-পাচ্য ছয়টী আনাজ সংগ্রহ করিয়া তাহার ঝোল খাইতে পারে। স্ত্রীলোকগণ ইহাকে ‘‘ছয় আনাজের ঝোল” কহে।

নাড়ী কাটা জন্য যে সকল সাংঘাতিক পীড়া উপস্থিত হইয়া শিশুকে বিপদ্‌গ্রস্ত বা একবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলে, তাহা এই ছয় দিনের মধ্যেই হইয়া থাকে। ছয় দিন অতীত হইলে আর তদ্বিষয় আশঙ্কা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এই জন্যই ষষ্ঠ দিনকে শিশুর পক্ষে একটী আনন্দের দিন বলিয়া কথিত

হয়। এই দিনে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ শুদ্ধাচারী হইয়া শিশুর কল্যাণার্থ সূতিকাঘরের চতুর্দ্দিকে বেদোচ্চারণ করিবে, সর্ব্বদা স্তুতি স্তব করিয়া বিশ্বপতির নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে। এই দিনে সন্তান-রক্ষয়িত্রী ষষ্ঠীদেবীর আরাধনা করা কর্ত্তব্য। রাত্রিকালেও জনয়িত্রীগণ সর্ব্বদা মিষ্ট আলাপনে পরস্পর তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করিবে।

প্রত্যহ স্নান করা প্রসূতির পক্ষে বড় হিতজনক নহে। দুই এক দিন পর অথবা ক্রমান্বয়ে বাদল হইতে থাকিলে দুই তিন দিন পর গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া স্নান করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রতিদিনই ঈষদুষ্ণ জলে কটী, পার্শ্ব, বস্তি প্রভৃতি স্থান উত্তমরূপ প্রক্ষালন করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

ইতিপূর্ব্বে যে কুঁড়ে ঘরে আগুণ রাখিবার কথা বলা হইয়াছে, এই সময় তাহা কাজে আসিবে। বস্ত্রবদ্ধ বা বালুকাপূর্ণ পুটুলী সেই আগুণের উপর ধরিয়া ঈষৎ গরম থাকিতে থাকিতে বালকের মস্তক, মস্তকের পশ্চাদ্-ভাগ, নাভি ও গুহ্যদ্বারে সময় সময় স্বেদ প্রদান করিবে। তদ্রূপ প্রসূতির বস্তি, বঙ্ক্ষণ, যোনি প্রভৃতি স্থান স্ফীত্ বা তত্তৎ স্থান বেদনাযুক্ত হইলেও স্বেদ প্রদান কর্ত্তব্য। ইহা বায়ুসঞ্চালক ও শ্লেষ্মাপহারক। উপযুক্ত সময় বালককে তৈল মাখাইয়া সূর্য্য-তাপিত জল দ্বারা প্রতিদিন

উত্তমরূপে স্নান করাইয়া দিবে। এইরূপে দশ দিন নিরাপদে অতিবাহিত হইলে একাদশ দিনে প্রসূতি নখাদি ছেদন ও বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া কুঁড়ে হইতে বাহির হইবে। এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি উত্তমরূপ মার্জ্জন করতঃ স্নান করিয়া এক খানি স্বতন্ত্র ঘরে অবস্থিতি করিবে। সেই সময় আপনার এবং প্রসূত সন্তানের যথোচিত সুশ্রূষা ভিন্ন প্রসূতিকে আর কিছুই করিতে হইবে না। অতিরিক্ত ব্যায়াম, ক্রোধ এবং শৈত্য ক্রিয়াদি সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। এই জন্যই স্বতন্ত্র ঘরে বাস করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সময় পোয়াতী সর্ব্বদা অশুচি থাকে বলিয়া সভ্য সমাজে তাহাকে কিছুই স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না। অথবা তাহার সংস্পর্শ্য কোনও বস্তু কেহ আহার করে না। ইহাই সমাজের উৎকৃষ্ট নিয়ম। যাহারা এই সকল নিয়ম অবহেলা করিয়া কৃত্রিম সভ্যতার খাতিরে স্বেচ্ছাচারিতার অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে অনেক সময় অনেক রূপ বিপদে পতিত হইতে হয়। তবে একাকিনী এক ঘরে নিয়ত বাস করা বড়ই কঠিন, তাই ইচ্ছা করিলে দুই একজন সহচরীও রাখা যাইতে পারে। ফলতঃ নিজ সন্তানকে নিজে পালন করিলে যতদূর সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পন্ন হয়, অন্য ধাত্রী দ্বারা কখনও ততদূর হইতে পারে না। এইরূপে তিন সপ্তাহ বা এক মাস অতীত হইলে যখন দেখিবে, প্রসূতির

শরীর বেশ সবল এবং পরিপাকশক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে, তখন তাহার আহার বিহার সম্বন্ধে অনেকটা স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া পুনর্ব্বার রজোদর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত কখন পতিসহবাস করিতে পারিবে না, অথবা অধিক পরিমাণে জলীয় বা গুরুপাচ্য বস্তুও আহার করিতে পারিবে না। প্রসবের পর হইতে পুনর্ব্বার রজোদর্শন পর্য্যন্ত যে কাল, সেই কালে অবৈধ আচরণ দ্বারা প্রসূতির কোন পীড়া হইলে তাহা প্রায়ই অসাধ্য বা কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। সুতরাং এই সময় যাহাতে কোনও পীড়া না জন্মে তদ্বিষয় বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত।

পার্ব্ব। ভাল, প্রসবের পর কতদিন পর্য্যন্ত প্রসূতিকে বিবেচনা করিয়া আহার বিহার করিতে হইবে ?

মহা। শিরা, ধমনী প্রভৃতি যে সকল স্রোতোপথ গর্ভাবস্থায় অবরুদ্ধ হয়, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া গেলেও তৎসমস্ত দুই তিন মাস পর্য্যন্ত সেই রূপেই থাকে। সুতরাং তখনও প্রসূতির মাসিক রজোদর্শন হইতে পারে না। পরে হিতজনক আহার বিহারে সেই সকল অবরুদ্ধ পথ ক্রমশঃ পরিষ্কার হইলে নিয়মিতরূপে মাসে মাসে আর্ত্তব নির্গত হইতে আরম্ভ হয় এবং তদ্রূপাবস্থায় আর তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় সাবধানে

থাকিবার কোনও প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ চতুর্থ মাসের মধ্যেই এরূপ হইয়া থাকে।

পার্ব্বা। আচ্ছা, ভাগ্যদোষে কুঁড়ে ঘরেই যদি সন্তানের প্রাণ-বায়ু নিঃশেষ হয় অথবা প্রসব হইতেই যদি সন্তান মরিয়া যায়, তবু কি ঠিক্ এই নিয়মেই প্রসূতিকে চলিতে হইবে ?

মহা। হাঁ, সন্তান মরিয়া গেলেও প্রসূতির নিজ দেহ রক্ষার জন্য আহার বিহার সম্বন্ধে সাবধান হইয়া থাকাই কর্ত্তব্য। তবে শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে সর্ব্বদা একাকিনী থাকিলে আরও অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, তাই দুই চারি জন সহচরীর সহিত মিষ্ট আলাপনে যথাসাধ্য অন্যমনস্ক থাকিবার চেষ্টা করাই উচিত। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় অশৌচ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বিধান আছে।

পার্ব্বা। ভাল, মৃত্যুর পরই যেন সপিণ্ড জ্ঞাতি-বর্গকে অশৌচ ভোগ করিতে হয়, জন্ম হইলে আর তদ্রূপ করিবার প্রয়োজন কি ?

মহা। প্রিয়ে! জননাশৌচে আর মরণাশৌচে অনেক প্রভেদ আছে। কেবল সমাজের কার্য্যবৃদ্ধি করিবার জন্য বা সামান্য লোকদিগকে ভুলাইবার জন্যই এই সকল নিয়ম সমাজমধ্যে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বিবেচনা করিয়া দেখিলে মরণাশৌচ অপেক্ষা জননা-

শৌচেরই একটা বাঁধাবাঁধি সামাজিক আটুনী থাকা আবশ্যক। কেননা, ইহার সহিত প্রসূতির স্বাস্থ্য-রক্ষার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। মরণাশৌচে মৃতব্যক্তির স্মরণার্থ অথবা তাহার প্রেতাত্মার কল্যাণার্থ কয়েক দিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিতে হয়। তাহার সহিত নিজেরও কিঞ্চিৎ ঐহিক পারত্রিকের মঙ্গল সম্ভাবনা আছে। এস্থলে সেই সমুদায় উল্লেখ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এক্ষণে কেবল জননাশৌচ সম্বন্ধেই দুই একটী কথা কহিতেছি। সন্তান হইলে জ্ঞাতিবর্গকে যে অশৌচ ভোগ করিতে হয়, তাহাকে প্রকৃতপক্ষে অশৌচ না বলিলেও কোন ক্ষতি নাই। কেননা খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে তাহাদিগকে কোনও বিচার করিতে হয় না। কেবল প্রসূত সন্তানের সহিত সাপিণ্ড্যতা বা রক্তগত সংস্রব আছে বলিয়াই উপাসনা প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য হইতে একটু অপসৃত থাকিতে হয়। সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে বিপ্র দশ দিনে, ক্ষত্রিয় বার দিনে, বৈশ্য পোনের দিনে এবং শূদ্র এক মাসে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা বেদাধ্যায়ী এবং সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, উপাসনা দ্বারা তাঁহাদের এক দিনেই অঙ্গাশৌচ দূর হয়। কেবল বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের পক্ষে তিন দিন অশৌচ ভোগ করা কর্ত্তব্য! জননাশৌচ সম্বন্ধে প্রসূতির পক্ষে এই নিয়ম খাটিবে না। প্রসূতি যে জাতিই হউক না কেন, তাঁহা-

দের সকলকেই একই নিয়মানুসারে চলিতে হইবে। পুত্র হইলে প্রসূতি বিশ দিনে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। আর যদি কন্যা হয়, তবে পূর্ণ এক মাসই অশৌচ ভোগ করা কর্ত্তব্য।

পার্ব্বতী। কেন, পুত্র কন্যায় এরূপ তারতম্য হইবার কারণ কি?

মহা। পূর্ব্বেই ত কহিয়াছি, জননাশৌচে প্রসূতির স্বাস্থ্যরক্ষার সম্পূর্ণ সংস্রব আছে। কন্যা হইলে যত দিন পর্য্যন্ত জননীর দৈহিক বৈপরিত্য থাকে, পুত্র হইলে ততদিন থাকে না। ইহাই এরূপ তারতম্যের কারণ। বিশেষতঃ এই প্রকার নিয়ম থাকায় প্রসূতিকে আর কোনও সাংসারিক কর্ম্ম দেখিতে হয় না, সুতরাং বাধ্য হইয়া সন্তানের লালন পালনেই যত্নবতী হইতে হয়।

পার্ব্বতী। আচ্ছা, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সন্তানের মৃত্যু হইলেই বা কি প্রণালীতে অশৌচ ভোগ করিতে হয়?

মহা। বালক গর্ভ হইতে বাহির হইয়া দন্তোদ্গমের পূর্ব্বে যে কোন সময়েই হউক, প্রাণত্যাগ করিলে, তাহার জন্য আর কাহাকেও অশৌচ ভোগ করিতে হয় না। অথবা ঐ বালকের জলক্রিয়া বা অগ্নি সংস্কারাদিও কিছু করিতে হয় না। কিন্তু প্রসূতিকে পূর্ব্বোক্ত সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক শরীরের ন্যায় আহার বিহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিয়মাতিরিক্ত স্বাধীনতা প্রদান করিলে, তাহার

নানা প্রকার বৈগুণ্য জন্মিতে পারে। সুতরাং অশৌচের মধ্যে সন্তানের মৃত্যু হইলে প্রসূতিকে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারেই চলিতে হইবে। আবার গর্ভ হইতে মৃত সন্তান পতিত হইলে সকলেরই নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে পূর্ণাশৌচ ভোগ করা কর্ত্তব্য। যদি প্রকৃত প্রসব না হইয়া গর্ভস্রাব কি গর্ভপাত হয়, তাহা হইলে যত মাসের গর্ভ বিনষ্ট হয়, ততদিন পরেই গর্ভিণী শুদ্ধি লাভ করিতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়।

সূতিকা রোগ।

এক সময় পার্ব্বতী বিনয় সহকারে কহিলেন, ভগবন্! সূতিকারোগ কাহাকে বলে? এবং কেনই বা ঐ সকল রোগের উৎপত্তি হইয়া অবলাদিগকে সাতিশয় যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে?

তদুত্তরে মহাদেব কহিলেন, প্রিয়ে! পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে সূতিনীদিগের দৈহিক কার্য্যের নানাপ্রকার ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠে। সেই সময় কোন কোন প্রসূতির জরায়ু মধ্যে কিছু না কিছু ক্লেদোময় পদার্থ সঞ্চিত থাকে, কাহারো বা সেই স্থান স্ফীত বা ক্ষত বিক্ষত হইয়া কাল সহকারে পাকিয়া উঠে, সুতরাং তদ্রূপাবস্থায় পরেও ক্লেদ সঞ্চয় হইতে পারে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, প্রসবান্তে রমণীদিগের জরায়ু ও জননেন্দ্রিয়ের কার্য্য ঠিক্ নিয়মিতরূপে সম্পন্ন হয় না। আরও জরায়ুর বিকৃতি জন্যই তৎসংলগ্ন বা সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য দৈহিক যন্ত্রগুলিও ভাবান্তরিত হইয়া যায়, সুতরাং তাহাদিগের কার্য্যেরও ব্যাঘাত জন্মিয়া উঠে। আমাশয়, পক্কাশয়, বৃক্কক ও গ্রহণী প্রভৃতি আশয় গুলি আংশিক বা সম্পূর্ণরূপ বিকৃত হয় বলিয়াই প্রসূতির পরিপাক-

শক্তি হ্রাস হইয়া যায়। আবার শরীরের মধ্যে যে সকল শ্রোতোপথ গর্ভাবস্থায় অবরুদ্ধ হয়, প্রসবের পরও তাহারা কিছুদিন সেইরূপেই থাকে। এই সময় অন্যায় রূপে আহার বিহার করিলে উপরোক্ত যন্ত্র গুলি আরও বিকৃত অবস্থায় পরিণত হয়, এবং পরিশেষে আপন আপন কার্য্য সাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রসূতিকে একবারে জার্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে জ্বর, অতিসার, শোথ, শূল, আনাহ, অরুচি, তন্দ্রা প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা প্রসূতি দিন দিন একবারে অবসন্না হইয়া পড়ে। কেহবা এইরূপে দীর্ঘকাল কষ্টভোগ করিতে করিতে অবশেষে সংসার-কারা হইতে চলিয়া যায়, কেহবা বাতব্যাধি দ্বারা চলচ্ছক্তি-বিরহিতা হইয়া চির-কাল যন্ত্রণাই ভোগ করিতে থাকে। ফলতঃ প্রকৃত-পক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিলে এস্থলে জ্বরাতীসারাদি এক একটী পীড়াকে স্বতন্ত্র কোন পীড়া বলিয়া অভিহিত করা যায় না। জরায়ু প্রভৃতি দৈহিক যন্ত্র গুলির বিকৃত ভাবই প্রকৃত পীড়া। সেই পীড়াকেই সূতিকা রোগ কহে। জ্বরাতীসার-শোথ-শূলাদি তাহারই উপসর্গ মাত্র।

পার্ব্ব। এই যে আবার বাতব্যাধির কথা কহিলে, উহাও কি সূতিকা রোগের উপসর্গ?

মহা। হাঁ, উহাও সূতিকা রোগের উপসর্গ ভিন্ন আর কিছুই নয়। যে প্রকার অতল জলধিতল হইতে

তুষার-মণ্ডিত অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখা পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্থানেই সদাগতি সর্ব্বদা প্রবাহিত হইয়া বিশাল ভূলোককে পরিপোষণ করিতেছে, সেইরূপ দেহীদিগের দেহমধ্যেও সদাগতি রস রক্তাদি নিয়মিতরূপে সঞ্চালন করিয়া সর্ব্বদা অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির অভাব পূরণ করিতেছে। তাহাতেই প্রাণীগণ ইচ্ছামত অঙ্গ চালনা করিতে সক্ষম হয়। কুৎসিত আহার বিহারে প্রসূতিদিগের দৈহিক বায়ুসঞ্চালনের পথ অবরুদ্ধ হইলে অল্প দিনের মধ্যেই তাহাদিগের সমস্ত বা কোন কোন অঙ্গ একবারে অবশ হইয়া যায়। কিন্তু সাধারণতঃ কটী হইতে তন্নিম্নস্থ স্থানেই এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। এরূপ হইলে আর প্রসূতির উত্থানশক্তি থাকে না। ইহাকেই সূতিকা রোগের উপসর্গ কহে। এতদ্ভিন্ন অন্য প্রকার হইলে তাহা স্বতন্ত্র বাতব্যাধি মধ্যেও পরিগণিত হইতে পারে।

পার্ব্ব। আরও শূল রোগের যে একটী কথা কহিলে, তাহাই বা কিরূপ ?

মহা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর কোন কোন প্রসূতির বায়ু অত্যন্ত কুপিত হইয়া ক্ষরিত রক্তকে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহাতেই তাহাদিগের হৃদয়, মস্তক এবং বস্তিতে এক প্রকার তীব্র বেদনা জন্মে, ইহাকেই শূল রোগ কহে। কেহ কেহ ইহাকে মক্কল শূলও কহিয়া থাকেন।

পার্ব্ব। তবে, কি কি উপায় অবলম্বন করিলে এই সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়?

প্রাণপ্রতিমা পার্ব্বতীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া জগৎপতি কহিলেন, ভবানি! ইতিপূর্ব্বে সূতিনীদিগের আহার বিহার এবং অশৌচ সম্বন্ধে যে সকল নিয়মাদির বিষয় উল্লেখ কবা হইয়াছে, কোন প্রকার কুতর্ক না করিয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে যাঁহারা সেই সকল নিয়ম রক্ষা করিতে প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে কখনও এই পীড়ায় যন্ত্রণা পাইতে হয় না। যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে সভ্যপদবাচ্য, যাঁহারা বহুকাল হইতে সংসার-ব্যাপারের প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া সমাজকে বিনা সূতায় বন্ধন করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা অনন্ত ক্রিয়া-সমুদ্র মন্থন করিতে কবিতে জ্ঞানামৃত পান করিয়া এক সময় আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিয়াছিলেন, যাঁহাদের আচার-বিচাব, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, ভাল মন্দ, খাদ্যাখাদ্য সমস্তই বিজ্ঞান-শাস্ত্রের যুক্তি-মূলক, কালক্রমে তাঁহাদের বংশেও যদি কোন ক্ষীণ-মস্তিষ্কের জন্ম হয়, আর সে যদি সমাজ-ভয়ে বা শাস্ত্রের প্রতি অন্ধ-ভক্তিপ্রভাবে উল্লিখিত নিয়-মাদি ভঙ্গ না করে, তবে তাহাকেও কখনো কোন প্রকার যন্ত্রণা পাইতে হয় না। বলিতে কি, এই বিশাল জগতে কাহারও কোন প্রকার বিপদ না হয়, তজ্জন্যই আজ্ তোমার নিকট এই সকল কথা এমন করিয়া বলিতেছি।

অথবা এবিষয়ে অধিক বাক্য ব্যয় করাও নিষ্প্রয়োজন। ধরণীতলস্থ প্রত্যেক সমাজের প্রতি একবার সমানভাবে দৃষ্টিপাত করিলেই জানিতে পারা যায় যে ম্লেচ্ছ, কিরাত প্রভৃতি নিকৃষ্ট সমাজে সূতিকা রোগের যতদূর প্রাদুর্ভাব, সভ্য সমাজে ততদূর নয়। আবার সভ্য বলিলেই যে প্রকৃত সভ্য হইল, এমন নয়। অধুনা তাহাও দুই প্রকার লক্ষিত হয়। যাঁহারা বহু পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহক কতকগুলি ধূর্ত্ততার সূত্র কণ্ঠস্থ করিয়া লৌকিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং শঠতা ও বঞ্চনা দ্বারা সর্ব্বদা নিরীহ লোকদিগের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, যাঁহারা খাতায় নাম লেখাইয়া অথবা কপালে সভ্যনামাঙ্কিত চিহ্ন আঁটিয়া জনসমাজে সভ্য বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা করেন, যাঁহারা বাহিরে নিজ নিজ শরীরকে দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখাইয়া বস্ত্রান্তরালে ক্লেদপূর্ণ রুমাল্ লুকাইয়া রাখেন, সেই সকল সৃষ্টিছাড়া কিম্ভূত কিমাকার সভ্যদিগের সম্বন্ধে কোন কথাই খাটিবে না। আমি যে সভ্যের কথা কহিতেছি, তদ্রূপ লোক নির্ণয় করিয়া লওয়া একটু বিবেচনা-সাপেক্ষ। সূক্ষ্মরূপে ভাবিয়া দেখিলে ভূমণ্ডলে একান্ত হিতকর বা একান্ত অহিতকর কিছুই লক্ষিত হয় না। একদিকে যদি কিছু ভাল হয়, অন্য দিকে তৎ-পরিমিত না হউক, কিছু না কিছু মন্দ অবশ্যই হইবে।

তবে মোটের উপর তুলনা করিয়া যে সকল নিয়মাদিতে দোষ অপেক্ষা গুণের ভাগ অধিক বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, ধী-শক্তি-সম্পন্ন মনীষিগণ দীর্ঘকাল হইতে ঘোর আন্দোলনে তন্ন তন্ন মীমাংসা করিয়া তাহাই সমাজ-মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। সেই সকল চির-প্রচলিত নিয়মের মধ্যে সময় সময় যে দুই একটী কৃত্রিম নিয়ম প্রচারিত হইয়া সভ্য সমাজকে দিন দিন উচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে, তৎপ্রতি কেহই কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করেন না। কেবল পূর্ব্বতন নিয়মস্থিত সামান্য দোষকেই একমাত্র লক্ষ্য করিয়া তাহা সমূলে পরিবর্ত্তন করিতে সর্ব্বদা যত্ন করিয়া থাকেন। অথচ সেই নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন নিয়ম প্রচলিত হইলে, তাহাতে যে কি মহান্ অনিষ্ট সংঘটিত হইবে, তাহা একবারও কেহ মনে করিয়া দেখেন না। এই শ্রেণীর আত্মাভিমানী কুলকুঠারগণ সংসার হইতে অপসৃত না হইলে কোন সমাজেরই মঙ্গল-সম্ভাবনা নাই। এই সকল বিষয় অবলোকন করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে নীরব থাকিলেও কখনো প্রকৃতি-পুঞ্জের ইষ্ট সাধিত হইতে পারে না। কেননা, সংসার যে ভালমন্দমিশ্রিত, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সেই নৈসর্গিক নিয়মানুসারেই একালপর্য্যন্ত সংসার চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বকালেও পরহিতৈষী পরম দয়ালু দেবগণ সাধারণের সুখসুবিধার জন্য কোন বিষয় আবিষ্কার বা কোন নিয়ম

প্রচলিত করিলে তখনি আবার বিপুল পরাক্রান্ত দানবকুল অন্য দিক্ হইতে খড়্গ হস্তে অভ্যুত্থিত হইয়া তাহা সমূলে নির্ম্মূল করিতে প্রাণপণে যত্ন করিত। এইরূপে শঙ্খাসুর, বৃত্রাসুর প্রভৃতি শত শত অসুর পবিত্র দেবরাজ্যকে সময় সময় বিধ্বস্ত করিয়া তুলিত। কিন্তু তাদৃশ অবস্থায় দেবগণ কখনও চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন নাই। তাঁহারা অটলভাবেই আপন আপন কর্ত্তব্য সাধনে সাতিশয় যত্নবান হইতেন। তাই সময় সময় দিন কয়েকের জন্য দানবগণ উন্নত হইয়া উঠিলেও চিরকাল সমানভাবে থাকিতে পারিত না। এস্থলে আরও একটী কথা মনে করিয়া দেখ, সেই যে অমিততেজা বল-গর্ব্বিত অসুরগণ দেবতাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া——তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত উৎকৃষ্ট নিয়মাবলী অযথা-দোষে দূষিত বলিয়া, এক সময় অনন্ত ক্রিয়া-সমুদ্র-মন্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন স্বকৃত কর্ম্মসম্ভূত সুতীক্ষ্ণ বিষের জ্বালায় দানব ভিন্ন আর কাহাদিগকে অভিভূত হইতে হইয়াছিল? সেইরূপ এই যে অভিনব সম্প্রদায় স্বাভিমানে বিমত্ত হইয়া উন্মাদের ন্যায় যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে, দেবতাদিগের পরীক্ষিত নিয়মরাশি উপহাসে উড়াইয়া দিয়া স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় লইয়াছে; বিধবা-বিবাহ, সধবা-বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতির একান্ত দাস হইয়া

পড়িতেছে; বাস-গৃহে সন্তান প্রসব, প্রসবান্তে যদৃচ্ছা আহার বিহার, এমন কি ধর্ম্মভাবেও লোকের বিদ্বেষ জন্মাইতে ক্রুটি করিতেছে না; এই সমুদায় কর্ম্মরাশির বিষময় ফলে তাহাদিগকেই এক সময় জড়িত হইয়া অবিরত ছট্‌ ফট্‌ করিতে হইবে। এই সকল বিষয় পরিশিষ্টাধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করিব। এক্ষণে কেবল এই মাত্র বলিতেছি যে, দেশদেশান্তরিত ভিন্ন ভিন্ন সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা' সুচারুরূপে পর্য্যা-লোচনা করিলেই এতদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইতে পারে, সুতরাং চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া না দিলেও কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত নাই।

অনন্তর অম্বিকা কহিলেন, ভগবন্‌! এই সকল কথা আর আমি শুনিতে চাই না, প্রস্তাবিত বিষয়ের অবতারণা করাই ভাল!

তখন পার্ব্বতী-বল্লভ কহিলেন, প্রিয়ে! সূতিকা রোগের সহিত সাধারণ রোগের নিদানাদি তুলনা করিয়া দেখিলে যে প্রকার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা তোমাকে কহিয়াছি। এক্ষণে তাহার চিকিৎসার বিষয়ও সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। সূতিকা রোগের চিকিৎ-সায় হস্তক্ষেপ করিতে হইলে প্রধানতঃ তিনটী বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। (১) জরায়ুর ক্লেদ নিবারণ ও তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দেওয়া। (২) কোষ্ঠাগ্নি

বর্দ্ধিত করা। (৩) জ্বরাতীসার প্রভৃতি উপদ্রবগুলি নিবারণ করিতে চেষ্টা করা। যোনি-গহ্বর বা জরায়ুতে ক্লেদ সঞ্চিত থাকিলে অথবা তত্তৎস্থান বিকৃতভাব প্রাপ্ত হইলে প্রথমে উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইবে। এইক্ষণ সেই বস্তি প্রয়োগের নিয়মাদিই কথিত হইতেছে।

তরল ঔষধপূর্ণ নলদ্বারা যোনি-রন্ধ্রে অথবা প্রয়োজন হইলে মূত্র-রন্ধ্রে পিচকারী দেওয়াকে বস্তি প্রয়োগ কহে। যে নলদ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাকে বস্তি-নেত্র কহা যায়। উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে মেষ, শূকর ও ছাগচর্ম্ম দ্বারা নেত্র প্রস্তুত করিয়া লইবে। তাহার অপ্রাপ্তি হইলে পক্ষিদিগের গলার চর্ম্মদ্বারাও কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে*। স্ত্রীলোকদিগকে বস্তি প্রদান করিতে হইলে তাহার নেত্রের মূলভাগ হইতে চারি অঙ্গুলি অন্তরে কর্ণিকা নিবেশ কর্ত্তব্য এবং নেত্রের স্থূলতা তাহাদের মূত্র-রন্ধ্রের ন্যায়, উহার দৈর্ঘ্যতা দশ অঙ্গুলি এবং মুদ্গ নির্গত হইতে পারে, এরূপ একটী ছিদ্র থাকা আবশ্যক। যোনি-পথে বস্তি প্রদান

* উপকরণ বিহীন পরপদাশ্রয় লাভার্থী হতভাগ্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের যে প্রকার অন্তিমকাল উপস্থিত, তাহাতে আর কিছুরই আশা করা যাইতে পারে না। স্বতরাং আজকাল বৈদেশিক ফিমেল্ পিচকারী দ্বারাও কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে।

আবশ্যক হইলে নেত্রের চারি অঙ্গুলি এবং মূত্র-পথে দিতে হইলে দুই অঙ্গুলি পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া দিবে।

রমণীদিগের গর্ভাশয় বিশুদ্ধির জন্য যোনি-মার্গে বস্তি প্রদান করিতে হইলে তাহাদিগকে উত্তানভাবে (চিৎ করিয়া) শয়ন করাইয়া জানুদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক স্থিরভাবে অবস্থিতি কবিতে কহিবে। পরে নেত্রমধ্যে দ্রব ঔষধপূর্ণ করিয়া তাহাব চারি অঙ্গুলি যোনিমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং নেত্রমধ্যস্থিত শলকা ২।৩ বার পীড়ন করিয়া অবশেষে ঔষধগুলি বাহির করিয়া ফেলিবে। যদি ঔষধ প্রত্যাগত না হয়, তবে বলপূর্ব্বক নাভির নিম্নদেশে পীডন করিবে। তাহাতেও কার্য্য-সিদ্ধি না হইলে সোঁদালপত্র ও সৈন্ধব লবণ, নিসিন্দার স্বরস ও গোমূত্রের সহিত একত্রে বাঁটিয়া বয়ঃক্রমানুসারে মুগ, এলাইচদানা বা সরিসার ন্যায় বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া শলাকা দ্বারা জননেন্দ্রিয়ের রন্ধ্র-মধ্যে নিহিত করিবে। অথবা গৃহধূম, বৃহতী, পিপুল, সৈন্ধব ও শুঁঠশুক্ত, গোমূত্র ও সুরার সহিত পেষণ করিয়া উল্লিখিতরূপ বর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া প্রয়োগ করিবে। যোনি-রন্ধ্রে বস্তি প্রদান করিতে হইলে স্নেহৌষধের মাত্রা ২ পল ও মূত্র-মার্গে প্রদেয় হইলে ১ পল হওয়া আবশ্যক। এইক্ষণ কতিপয় ঔষধের কথা কথিত হইতেছে।

৮। বাঁশের কোঁড়, খদির, নিম্ব, আকন্দ, বেণু,

জায়ফল, আম্র, জম্বু, জিঙ্গিনী ও বাসকমূল, এই সমুদায়ের ক্বাথ কিস্‌মিস্‌কৃত মদ্য এবং শুক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিচকারী প্রদান করিলে যোনির আস্রাব বিনষ্ট হয়।

২। গোমূত্র, তক্র ও শুক্ত একত্রে মিশ্রিত করিয়া যোনিধাবন করিলে আভ্যন্তরীণ ক্ষত ও ক্লেদ নির্গমন দূরীভূত হয়।

৩। ঐরূপ ত্রিফলার ক্বাথদ্বারা ধৌত করিলেও ক্ষতাদি উপশমিত হইয়া থাকে।

৪। মৃদু অগ্নিতে বেতমূলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা যোনি ধৌত করিলে যোনি দৃঢ় হয়।

এতদ্ভিন্ন দৈহিক বল এবং দোষত্রয়ের ন্যূনাতিরিক্ত বিবেচনায় অনুবাসনাধিকারোক্ত অন্য কোন স্নেহৌষধও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সূতিকাবস্থায় কোষ্ঠাগ্নির অল্পতা এবং দৈহিক স্রোতোপথাদির নিরোধ বশতঃই রোগসমূহ ক্রমশঃ নিতান্ত সাংঘাতিক হইয়া উঠে এবং পরিশেষে রোগিণীর জীবনী-শক্তি একবারে হ্রাস করিয়া ফেলে। এই জন্যই সাধারণ রোগাধিকারোক্ত সকল প্রকার ঔষধদ্বারা ইহার কোন প্রতীকার হয় না। যে সকল ঔষধের উপকরণসমষ্টির মধ্যে অগ্নিদীপক, উত্তেজক, বলকারক, দোষসঞ্চালক এবং শরীরের লঘুতা-সম্পাদক পদার্থই বেশী, তদ্দ্বারাই বিলক্ষণ ফল পাওয়া

যায়। সূতিকাবস্থায় প্রযুক্ত কতকগুলি ঔষধের নাম ও প্রয়োগস্থলের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা—

অমৃতাদি।—গুলঞ্চ, শুঁঠ, ঝাঁটিমূল, গন্ধভাদালীয়া, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও মুথা, সমুদায়ে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল /॥০ সের, শেষ আধ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু ॥০ তোলা। আহারে অনিচ্ছা, অল্প অল্প জ্বর, এবং স্রোতোপথাদির নিরোধ অনুমিত হইলে এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ ফল পাওয়া যায়।

দশমূল।—বিল্বছাল, নাগশোনা, গাম্ভারী, পারুলী, গনিয়ারী, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, মিলিত ২ তোলা, জল /॥০ সের, শেষ আধ পোয়া, প্রক্ষেপ ঘৃত। এতদ্দ্বারা শরীরের তীব্র বেদনা ও জ্বর উপশমিত হয়।

সূতিকা দশমূল।—শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, নীলঝাঁটিমূল, গন্ধভাদালীয়া মূল, শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুথা। এই সকল বস্তু পূর্ব্ববৎ ২ তোলা পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধসের জলে পাক করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিতে দিবে। তীব্র দাহসংযুক্ত জ্বরে ইহা প্রশস্ত।

সহচরাদি।—ঝাঁটিমূল, কুড়, বেতের মূল, বঁইচমূল, দেবদারু মিলিত ২ তোলা, পূর্ব্ববৎ পাক করিয়া সৈন্ধব ৪ মাষা ও হিং ২ রতি প্রক্ষেপ দিবে। সর্ব্বাঙ্গে বিশে-

যতঃ কটীর নিম্নে তীব্র বা অল্প অল্প বেদনা থাকিলে, এবং শরীর অত্যন্ত ভার ভার বোধ হইলে এই যোগ প্রযোজ্য। ইহা জ্বরনাশক এবং শরীরের লঘুতাসম্পাদক। অথবা ঝাঁটিমূল, মূথা, গুলঞ্চ, গন্ধভাদালীয়া, শুঁঠ, বালা। অঙ্গবেদনা ও জ্বরনিবারণার্থ ইহাদের ক্বাথে অৰ্দ্ধ তোলা মধু প্রক্ষিপ্ত করিয়া পান করিলে কিম্বা কেবল ঝাঁটিমূল ২ তোলা পূর্ব্ব নিয়মে পাক করিয়া ১ মাষা পিপুলচূর্ণের সহিত পান করিলে অত্যন্ত অগ্নিবৃদ্ধি ও প্রসূতির জ্বরাদি বিনষ্ট হয়।

পঞ্চজারক গুড়।—যোনিবিকৃতি, কাস, শ্বাস, স্বরভেদ, হলীমক, পাণ্ডুরোগ, অতি কষ্টে অল্প অল্প মূত্রত্যাগ, এই সকল লক্ষণ বৰ্ত্তমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রযোজ্য। ইহা স্ত্রীগণ সুস্থাবস্থায়ও নিয়ত সেবন করিতে পারে। তদ্দ্বারা উপকার ভিন্ন অপকারের সম্ভাবনা নাই।

বজ্রকাঞ্জিক।—অগ্নিমান্দ্য, আমবাত, মক্কলশূল অর্থাৎ প্রসূতির হৃদয়, বস্তি ও মস্তকের তীব্রবেদনা, স্তন্যাভাব, এবং কফদুষ্ট অনুমিত হইলে এই কাঞ্জিকদ্বারা সবিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়। মাত্রা ১ পল।

সৌভাগ্যবটী।—স্বর্ণঝিণ্টির পাতার রসের সহিত একটী করিয়া বটী মাড়িয়া সেবন করিলে তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ প্রভৃতি উপদ্রবসংযুক্ত ঘোরতর জ্বর নিবারিত হয়।

কস্তুরী ভৈরব।—প্রবল জ্বর, নাড়ী নিতান্ত সূক্ষ্ম বা দুর্ব্বল এবং বিষমভাবে স্পন্দিত ইত্যাদি বৈকারিক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। ঈষৎ দগ্ধ আদার রসের সহিত ঔষধ সেবনীয়। ঔষধ-সেবনান্তে কাহারও কাহারও হিক্কা হইয়া থাকে, তদ্রূপা-বস্থায় মধুর সহিত মরিচচূর্ণ বারম্বার অবলেহন করা কর্ত্তব্য। আবার বৈকারিক লক্ষণ প্রকাশ পাইবার উপক্রম হইলেও এই ঔষধদ্বারা বিলক্ষণ ফল পাওয়া যায়। কিন্তু তখন শুদ্ধ মধুর সহিতই সেবন করা উচিত। হৃৎপিণ্ডের কার্য্যবৈলক্ষণ্যই সকল প্রকার বিকারোৎ-পত্তি ও নাড়ীবৈষম্যের প্রধান কারণ। তন্মধ্যে আবার শ্লেষ্মা কুপিত হইলে নাড়ী একেবারেই সূক্ষ্মতন্তুবৎ হইয়া যায়। এই ঔষধদ্বারা প্রকুপিত শ্লেষ্মা অচিরে সাম্যভাব অবলম্বন করে, এবং হৃৎপিণ্ডের কার্য্যও সংশো-ধিত হয়। সুতরাং ইহা সকল প্রকার বিকারাবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। জ্বর ব্যতীত অতীসার দ্বারাও যদি বৈকারিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, তথাপি এই ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। অনুপান শুদ্ধ মধু অথবা মধুর সহিত ঈষ-দুষ্ণ পিপুলমূলের রস।

সূতিকারীরস।—ইহা সূতিকাজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ, কিন্তু তরুণাবস্থায় প্রযোজ্য নহে। যদি সর্ব্বদাই মন্দ মন্দ জ্বর অনুভূত হয়, আর সেই সঙ্গে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি,

তৃষ্ণা, শোথ বিদ্যমান থাকে, তবে এই ঔষধ দ্বারা আশ্চর্য্যরূপ ফল পাওয়া যায়। অথবা ঐ সকল লক্ষণ-বিশিষ্ট সবিরামজ্বরেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ এক টুকরা আদা আগুণের উপর ধরিয়া কিঞ্চিৎ পোড়াইয়া লইবে। পরে তাহারই রসের সহিত একটী করিয়া বটী মিশ্রিত করিয়া এক একবার সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ সূতিকাবিনোদ রস।—অন্যান্য দোষ অপেক্ষা কফের আক্রমণ বেশি হইলে, উৎকাসি, অগ্নিমান্দ্য এবং সেই সঙ্গে একটু একটু জ্বর ও রক্তাল্পতা থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। মধুর সহিত সেব্য।

সূতিকাহর রস।—যে স্থলে অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় রোগেরই প্রবলতা লক্ষিত হয়, এবং সেই সঙ্গে অবিরাম বা সবিরাম জ্বরও অনুভূত হয়, সেই স্থলেই ইহা প্রয়োগ করিবে। ২ তোলা পরিমিত ঝাঁটি দ্বারা যথাবিধি ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে একটী করিয়া বটী মাড়িয়া লইবে এবং তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ পিপুলচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ সূতিকাবল্লভ রস।—গ্রহণী, অতীসার, দৌর্ব্বল্য ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নিবারণার্থ এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। উল্লিখিত লক্ষণ ব্যতীত কেবল জ্বরে ইহা প্রয়োগ করা উচিত নহে। প্রবল জ্বরের সহিত অতী-

সার উপস্থিত হইয়া যদি সূতিনীকে নিতান্ত বিপদগ্রস্ত করিয়া ফেলে এবং অতিসার দ্বারাই শীঘ্র অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা বোধ হয়, তাহাহইলে মধু অথবা ঝাঁটীমূলের রস ও মধুর সহিত এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। আর অতীসারের তত প্রাবল্য না থাকিলেও ঠিক্ এই নিয়মেই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। কিন্তু সেবনের পরে পূর্ব্বোক্ত সহচরাদিগণের ক্বাথ অনুপান করিবে। সূতিকাকালের মধ্যেই হউক অথবা সেইকাল অতীত হইলে অন্য কোন সময়েই হউক, গ্রহণী দোষ দ্বারা শরীর একেবারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গেলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। ইহা বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধিকারক। অনুপান মধু বা ছাগদুগ্ধ।

মহাগন্ধক।—অনেকের বিশ্বাস যে কেবল বালক-দিগের উদরাময় রোগেই ইহা সবিশেষ কার্য্যকারী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূতিকারোগেও এতদ্দ্বারা সুন্দর রূপ ফল পাওয়া যায়। যদি সর্ব্বদাই অল্প অল্প জ্বর সংলগ্ন থাকে অথবা প্রত্যহ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে জ্বরের বেগ অপেক্ষাকৃত প্রবল হয়, আর সেই সঙ্গে উদরের পীড়া বিলক্ষণ বিদ্যমান থাকে এবং দিন দিন সূতিনী নিতান্ত বিশীর্ণা হইয়া যায়, তবে প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ আদার রসের সহিত একটি করিয়া সূতিকারিরস এবং অপরাহ্নে মুথার রস ও মধুর সহিত বাঁটিয়া মহাগন্ধক সেবন

ব্যবস্থা করিলে সপ্তাহমধ্যেই সূতিনী সুন্দর রূপে স্বাস্থ্য লাভ করিবে। পরে আরও এক সপ্তাহ ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। ইহা বারম্বার পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে।

মহাভ্রবটী।—দীর্ঘকাল হইতে সূতিকাসংযুক্ত উদরাময় এবং জীর্ণ জ্বরে শরীর একেবারে জীর্ণ শীর্ণ বা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেলে এই ঔষধ প্রয়োজ্য। শরীরে শোথের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। মধু ও খুদিয়া থান্‌কুনির রসের সহিত সেব্য।

নৃপবল্লভ।—চাউল ধোওয়া বা উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে অতীসার ও অজীর্ণ নিবারিত হয়। বমি বা বমির বেগ বর্ত্তমান থাকিলে সদ্য মুড়ি ভিজাইয়া তাহার জলের সহিত সেবন ব্যবস্থা করিবে।

স্বল্প গঙ্গাধর চূর্ণ।—কিঞ্চিৎ মধু ও চাউল ধোওয়া জলের সহিত একমাষা পরিমাণে সেবন করিলে প্রবল অতীসার ও সংগ্রহ গ্রহণী প্রভৃতি উপশমিত হয়।

জীরকাদি মোদক।—প্রত্যহ প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ ছাগদুগ্ধ বা শুদ্ধ জলের সহিত ইহার অর্দ্ধতোলা সেবন ব্যবস্থা করিবে। ইহা অগ্নিবৃদ্ধিকারক এবং সূতিকা-সংযুক্ত গ্রহণী রোগে প্রয়োজ্য। পরন্তু এতদ্দারা জরায়ু ও জননেন্দ্রিয়ের কার্য্যও শীঘ্র শীঘ্র নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহ হইতে আরম্ভ হয়।

বৃহজ্জারকাদি মোদক।—দীর্ঘকালোত্থিত অতীসার, সংগ্রহ গ্রহণী, জীর্ণ জ্বর, শরীর বিশীর্ণ এবং পাণ্ডুবর্ণ, আহারে অনিচ্ছা, পিপাসা, গ্লানি, সার্ব্বাঙ্গিক দাহ, পেটের বেদনা এবং স্বাভাবিক শরীরে যে সময় ঋতু হইয়া থাকে, সেই সময় উপস্থিত হইলে সপ্তাহ, দশাহ বা ততোধিক কাল পর্য্যন্ত যোনিস্রাব ইত্যাদি লক্ষণ একত্রে প্রকাশ পাইলে বা ইহার মধ্যে কোন লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। আবও এতদ্দ্বারা বল বীর্য্যাদিও বৃদ্ধি হইয়া থাকে! মাত্রা অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা পয্যন্ত। প্রাতে গব্য দুগ্ধ ও চিনির সহিত সেবনীয়।

অগ্নিকুমার মোদক।—দুঃসাধ্য গ্রহণী, শ্বাস, কাশ আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, জীর্ণজ্বর এবং ৫। ৭ দিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত উদর স্ফীত থাকিয়া পরে ২। ১ দিন প্রবল অতিসাব, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অগ্নিকুমার মোদক প্রয়োজ্য। প্রাতঃকালে শীতল জল বা ছাগদুগ্ধের সহিত সেবনীয়। মাত্রা অর্দ্ধতোলা।

সৌভাগ্য শুণ্ঠী।—স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট মোদক। অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে প্রত্যহ ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করা কর্ত্তব্য, অথবা পূর্ব্বে ঔষধ সেবন করিয়া পরেও কিঞ্চিৎ ছাগদুগ্ধ অনুপান করা যায়। সূতিকাসংযুক্ত গ্রহণী, সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ সন্ধি-

স্থলের বেদনা, কাসি, শ্বাস, শরীর পাণ্ডু বা ফেকাসিয়া বর্ণ, অম্লোদ্গার, বুকজ্বালা, ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে যোনি-দ্বার দিয়া রক্ত নির্গমন, এবং স্তনরোগ প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। এতদ্দ্বারা রমণীদিগের শরীর বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া অচিরে অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন হয়।

ভদ্রোৎকটাদ্যবলেহ।—সংগ্রহগ্রহণী, উদরস্ফীতি, উদরের বেদনা, অরুচি ও তৃষ্ণা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ অবলেহন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক।

জীরকাদ্যরিষ্ট।—এই অরিষ্টের মাত্রা ২ তোলা, ইহা সেবন করিলে দীর্ঘকালোত্থিত সকল প্রকার সূতিকা রোগ, অতীসার এবং অগ্নিবিকৃতি নিরাকৃত হয়।

ভদ্রোৎকটাদ্যঘৃত।—দুঃসাধ্য গ্রহণী, গুহ্যদ্বারের তীব্রবেদনা, গুদভ্রংশ এবং পাণ্ডুরোগ প্রকাশ পাইলে এই ঘৃত প্রশস্ত। ইহা অগ্নিবৃদ্ধিকারক এবং স্তন্য-বিশোধক।

ধাতক্যাদি তৈল।—এই তৈল মস্তক, বক্ষ, নাভি এবং তলপেটে মর্দ্দন করিতে হয়। সূতিকারোগ দ্বারা বিশীর্ণা সূতিনী এতদ্দ্বারা পূর্ব্বলাবণ্য প্রাপ্ত হয়। চিকিৎসাকালে রুগিনীদিগের পক্ষে সুপথ্যাভিলাষিণী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

বলা তৈল।—ইহা সকল প্রকার বাতবিকার-নিবা-

রক। প্রবল সূতিকা দ্বারা যে সকল রমণী একবারে অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে, এই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে তাহারা অচিরে স্থিরযৌবন প্রাপ্ত হয়। হিক্কা, শ্বাস, কাস ও আক্ষেপ নিবারণার্থ ইহা মস্তক ও বক্ষঃস্থলে মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য। গুল্মরোগ শান্তির জন্য অধিকন্তু তলপেটে মর্দ্দন করিতে হইবে।

অঙ্গশোষ, পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত এবং কটিপার্শ্ব প্রভৃতি স্থানের অকর্ম্মণ্যতা দূরীকরণার্থ তত্তৎ স্থানে কুব্জপ্রসারিণী তৈল ও মহামাষ তৈল মর্দ্দন করাই প্রশস্ত।

প্রসূতির হৃদয়, মস্তক ও বস্তিদেশে তীব্রবেদনা হইলে ঘৃত কিম্বা উষ্ণজলের সহিত যবক্ষার পান করা কর্ত্তব্য। পিপুল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, হরীতকী, আমলকী ও শটী ইহাদের ক্বাথের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলেও উক্ত স্থানের বেদনা নিবারণ হয়।

স্তনরোগ।

স্নেহের অল্পতাবশতঃ অথবা জাতাপত্যা রমণীর কোন প্রকার পীড়াবশতঃ স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হইতে পারে না, তজ্জন্য নবপ্রসূত বালক দিন দিন ক্ষীণ ও রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। তাদৃশ অবস্থায় নিম্নলিখিত যোগগুলি প্রয়োগ করা বিধেয়। যথা ;—

১। কাঞ্জিকের সহিত বনকার্পাসমূলচূর্ণ ২ তোলা প্রসূতিকে সেবন করাইলে উপকার হইয়া থাকে।

২। ৮ তোলা ইক্ষুমূলচূর্ণও ঐরূপে সেবন করিতে দেওয়া যায়।

৩। একছটাক মদ্যান্নের সহিত ২ তোলা ভূমি-কুষ্মাণ্ডমূল সেবন করিলে অচিরাৎ কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। ঔষধ সেবনান্তে দুগ্ধান্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য।

৪। প্রত্যহ অর্দ্ধতোলা শালীতণ্ডুলচূর্ণ একছটাক দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে এবং দুগ্ধান্ন ভোজন করিতে ব্যবস্থা দিবে।

৫। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, ইন্দ্রযব ও যষ্টি-মধু; অথবা বচ, মুথা, আতইচ, হরীতকী, দেবদারু ও নাগেশ্বর। যথানিয়মে ইহাদিগের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অচিরে স্তন্যদুগ্ধের বৃদ্ধি হয়। অধিকন্তু আমাশয়ের পীড়া বর্ত্তমান থাকিলেও এতদ্দারা সবিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়।

এক্ষণে দূষিত স্তন্যের বিষয় কথিত হইতেছে। বাত-পিত্তাদি ধাতুদ্বারা কখনও কখনও রমণীদিগের স্তনদুগ্ধ দূষিত হইয়া থাকে। সেই অবিশুদ্ধ স্তন্য পান করিলে বালকদিগের নানাপ্রকার পীড়া জন্মিয়া থাকে। সুতরাং দুগ্ধ-জীবী শিশুদিগের পীড়া হইলেই প্রথমে তাহার জননীর অথবা স্তন্য-দায়িনীর দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

যে দোষে স্তন্য দূষিত হইয়াছে বুঝিতে পারিবে, তদনুসারে তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। নতুবা হাজার ঔষধ প্রয়োগ করিলেও পীড়িত বালকের কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। যে দুগ্ধ পীতবর্ণ, মধুর এবং জলের উপর নিক্ষেপ করিলে সর্ব্বতোভাবে মিশিয়া যায়, তাহাই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। উহা পান করিলে বালকদিগের কোন প্রকার পীড়াই হইতে পারে না। যে দুগ্ধ কষায় এবং লঘু অর্থাৎ জলের উপর পতিত হইলে ভাসিয়া উঠে, তাহাকে বাতদূষিত; যাহা তিক্ত অম্ল ও লবণাস্বাদযুক্ত এবং পিত্তরেখাবিশিষ্ট, তাহাকে পিত্তদূষিত; আর যাহা ঘন, পিচ্ছিল ও জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়, তাহাকে কফদূষিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই দূষিত স্তন্যই বালকদিগের নানাপ্রকার রোগোৎপত্তির প্রধান কারণ।

এতদ্ভিন্ন আরও এক প্রকার স্তন-রোগ আছে, তাহাকে স্তন-বিদ্রধি কহে। এই রোগ স্তনদেশের অভ্যন্তরে এবং বহির্ভাগে উভয় স্থলেই প্রকাশ পাইতে পারে। পণ্ডিতগণ ইহাকে ছয় প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সন্নিপাতজ, আগন্তুজ এবং অবরোধজ। প্রকুপিত বাতপিত্তাদি দ্বারা স্তনস্থ রক্তমাংস দূষিত হইলে প্রথমোক্ত চারি প্রকার বিদ্রধি উৎপন্ন হয়। অভিঘাত দ্বারা আগন্তুজ বিদ্রধি এবং কোন কারণবশতঃ দুগ্ধ নিঃসরণের রন্ধ্র অবরুদ্ধ

হইলে অবরোধজ বিদ্রধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। মেয়ে লোকেরা সাধারণ ভাষায় ইহাকে ঠুন্‌কা রোগ কহিয়া থাকে। অনেকস্থলে ইহার জন্য কোনও চিকিৎসকের আশ্রয় লইতে হয না। আপনা হইতেই আরাম হইয়া থাকে। হিন্দু মহিলাদিগের প্রায় সর্ব্বদাই এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু একটু গুরুতর আকার ধারণ না করিলে আর কাহারও নিকট তাঁহারা ইহা প্রকাশ করেন না। এই সামান্য পীড়ার জন্য কোন কোন সময় আবার অস্ত্র প্রয়োগও করিতে হয়। অসময়ে বা অনুপযুক্ত লোক দ্বারা অস্ত্র প্রযোগ করাইলে কাহারও কাহারও সমগ্র স্তন পর্য্যন্তও পচিয়া যায়। তাদৃশ অবস্থায় জ্বরাদি উপদ্রব উপস্থিতহইলে জীবনাশায় নিরাশ হওযাই সিদ্ধ। এইক্ষণ এই রোগের চিকিৎসার বিষয় কথিত হইতেছে। পীড়ার প্রথমাবস্থায় স্তনাভ্যন্তরে তীব্র বেদনা উপস্থিত হইয়া রোগিনীকে সাতিশয যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। পরে উহা অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া ক্রমে ক্রমে ফুলিয়া উঠে। এই সময় কাহারও কাহারও প্রবল জ্বরও হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে দূষিত স্তন্যের যে প্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ঠিক্ সেই অনুসারে এবং নাড়ী স্পন্দনের তারতম্যানুসারে দোষাদি বিবেচনা করিয়া ইহার চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। প্রথমে শোথ বসাইয়া দিবার

চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। স্তনমধ্যে অধিক পরিমাণে দুগ্ধ সঞ্চিত না থাকে, এজন্য নিঃশেষরূপে দুগ্ধ দোহন করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

বাতজ বিদ্রধিতে সজিনামূলের ছালদ্বারা প্রলেপ দিলে শীঘ্র উপকার দর্শে। যব, গোধূম ও মুগ সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অপক্ক বিদ্রধি শীঘ্র উপশমিত হয়। পুনর্নবা, দেবদারু, শুঁঠ ও দশমূলের ক্বাথে গুগ্-গুল বা এরণ্ড তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

পৈত্তিক শোথে অনন্তমূল, খই ও যষ্টিমধু চিনির সহিত; ক্ষীরকাকোলী, বেণার মূল ও রক্তচন্দন দুগ্ধের সহিত; বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, বেত, ইহাদের ছাল ঘৃতের সহিত; অথবা যষ্টিমধু, অনন্তমূল, দূর্ব্বা, নলমূল ও রক্তচন্দন, দুগ্ধের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

শ্লৈষ্মিক স্তন-শোথে ইষ্টকচূর্ণ, বালি, লৌহচূর্ণ, গোময়, তুষচূর্ণ একত্রে গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া এরণ্ড পত্র দ্বারা বেষ্টিত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া শোথের উপর প্রলেপ দিবে।

রক্তজ ও আগন্তুজ বিদ্রধিতে পৈত্তিক বিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

অন্তর্বিদ্রধিতে দুগ্ধবাহী পথ অবরুদ্ধ হইলে স্তন অতিশয় কঠিন ও বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাতেও জ্বর প্রকাশ হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় প্রথমে শ্বেত

পুনর্ন্নবার মূল ও বরুণ বৃক্ষের মূল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ পান করিতে দিবে। আকনাদিমূল, মধু ও আতপতণ্ডুলের জলের সহিত সেবন করিলে অন্তর্বিদ্রধি প্রশমিত হয়। জলধৌত সজিনামূলের রস মধুর সহিত পান করিলে শীঘ্র যন্ত্রণার লাঘব হয়। ইহাতেও দুগ্ধ নিঃসরণ করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

ধুতূরামূল ও হরিদ্রা একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে সকল প্রকার স্তন-শোথ শীঘ্র উপশমিত হয়। রাখাল সসার মূল দ্বারা প্রলেপ দিলেও সবিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়। অগ্নিতপ্ত সির্কাতে কোন বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া তাহা স্ফীত স্থানের উপর বসাইয়া দিবে। এবং বস্ত্রখণ্ড শুষ্ক হইতে আরম্ভ করিলে পুনর্ব্বার তাহা উক্ত সির্কা দ্বারা সিক্ত করিবে। ইহা স্তনরোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

যদি শোথস্থান ক্রমে পাকিয়া উঠে, তাহা হইলে উহা বসাইয়া দিবার চেষ্টা করা কোন মতেই উচিত নহে। তদ্রূপাবস্থায় কোন কৃতকর্ম্মা বিজ্ঞ শস্ত্র-চিকিৎসকের হস্তে তাহার চিকিৎসারভার অর্পণ করাই একান্ত যুক্তি-সিদ্ধ। শস্ত্র পাতের কথা শুনিয়া যে সকল রমণী একান্ত ভীতা ও চমকিতা হইয়া উঠেন, তাঁহাদিগের স্তন-শোথে প্রথমতঃ নিম্নলিখিত ঔষধগুলিই প্রয়োগ করিবে।

গরুর দাঁত জলে ঘষিয়া তাহার কিছুমাত্র স্তন-শোথে লাগাইয়া দিলে উহা পাকিয়া বিদীর্ণ হইয়া যায়।

সাপের খোসা ভস্ম করিয়া তাহার সহিত সর্ষপ-তৈল মিশাইয়া লাগাইয়া দিলে শোথ শীঘ্র বিদীর্ণ হয়। তদ্রূপ পায়রা, শকুনী, ও কঙ্কপক্ষীর বিষ্ঠাদ্বারাও শোথ বিদীর্ণ হইয়া থাকে।

কৃষ্ণতিল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়িমূল, যষ্টিমধু, নিমপত্র, এই সমুদায় সমভাগে বাটিয়া সৈন্ধব লবণ ও ঘৃতসংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে পূঁয প্রভৃতি নিঃসৃত হইয়া যায়।

নিমপত্র, তিল, দন্তীমূল, তেউড়ি, এই সমুদায় সমভাগে বাটিয়া সৈন্ধব লবণ ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে দুষ্টব্রণ উপশমিত হয়। ইহা অতিশয় শোধক এবং পূঁযাদি নিঃসারক। কেবল অনন্তমূল বাটিয়া প্রলেপ দিলেও ব্রণ হইতে পূঁযাদি নিঃসৃত হইয়া যায়।

মানুষের কপালাস্থি গোমূত্রে ঘষিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত নিবারণ হয়।

উচ্ছে পত্র, শালিঞ্চশাক, কানছিড়া ও তুলসীপত্র, ইহাদের প্রত্যেকের প্রলেপ দ্বারা ব্রণ নষ্ট হয়।

লোহার কোদালে পাতিলেবুর রসের সহিত শ্বেত আকন্দের মূল ঘষিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্র ক্ষত নিবারণ হয়।

শ্বেতকরবী মূলের রস ।০ এক পোয়া ও গব্যদুগ্ধ এক সের একত্রে মিশ্রিত করিয়া রাখিবে, পরে তাহা হইতে যে দধি উৎপন্ন হইবে, তাহা মন্থন করিয়া নবনীত উদ্ধৃত করিয়া লইবে, সেই নবনীত দ্বারা প্রলেপ দিলে শীঘ্র ক্ষত নিবারণ হয়। হাপরমালীর আটা দ্বারাও ক্ষত উপশমিত হইয়া থাকে।

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া মিলিত ২ তোলা, অর্দ্ধ সের জলে পাক করিয়া ৵০ আধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত গুল্‌গুল্ ৪ মাষা উত্তমরূপে গুলিয়া পান করিবে; ইহাতে পাক, পূঁযাদি স্রাব, দুর্গন্ধ, বেদনা ও শোথবিশিষ্ট প্রবল ব্রণ উপশম প্রাপ্ত হয়। জাত্যাদ্য ঘৃত এবং ব্রণরাক্ষস তৈল সকল প্রকার ক্ষতের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এইক্ষণ আরও কয়েকটী সাধারণ ঔষধের কথা উল্লেখ করিতেছি। প্রসবান্তে কোন কোন রমণীর স্তন নিতান্ত শিথিল হইয়া লম্বিত ভাবে ঝুলিয়া পড়ে। সেইরূপ অবস্থায় এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়; যথা :—

মাহিষ নবনীত, কুড়, বেড়েলা, বচ ও গোরক্ষ চাকুলে এই সমুদায় পেষণ করিয়া স্তনে মর্দ্দন করিলে স্তন স্থূল ও কঠিন হয়।

গাম্ভারীর মুলের ক্বাথ ও কল্কের সহিত তিলতৈল

পাক করিয়া উহাতে তুলা ভিজাইয়া স্তনের উপরি স্থাপিত করিলে লম্বিত স্তন পুনর্ব্বার উত্থিত হয়।

আবার কটীদেশ স্বাভাবিক অপেক্ষা স্থূল হইলে যদি পিঁপুল মূল বাঁটিয়া নির্জ্জল তক্রের সহিত পান করা যায়, তাহা হইলে উহা পূর্ব্ববৎ ক্ষীণতর হইয়া থাকে।

অষ্টম অধ্যায়।

একদা সর্ব্বসন্তাপহারী জরামৃত্যুরহিত অনাদি পুরুষ, ত্রিলোক-তৃপ্তিকর উত্তুঙ্গ কৈলাসোপরি উপবিষ্ট হইয়া রজত প্রভায় দিক্ সমূহ আলোকিত করিতেছিলেন। সহসা স্বত্ব রজঃ ও তমগুণান্বিতা প্রকৃতিরূপিনী পার্ব্বতী সেই সময় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সুবিশাল নভোমণ্ডলস্থিত চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি তাঁহারই সহিত যুক্ত হইবার জন্য অবিরত চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সেই বিশাল দেহসমুদ্ভব অপূর্ব্ব রুদ্র তেজকে পরাভব করিয়া কোন মতেই অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। কেবল উভয় শক্তিতে পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া শূন্য পথে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তদ্দর্শনে মহাদেবী ভক্তিভাবে বিগলিতা হইয়া সেই মহাপুরুষকে নানাবিধ স্তব করিতে লাগিলেন। তখন কুন্দ-বিনিন্দিত শুভ্রকান্তি মহাদেব ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়তমে! তোমাকে আর অধিক পতি-ভক্তি দেখাইতে হইবে না। ইতিপূর্ব্বে যে একদিন শিশুদিগের রোগের কথা শুনিতে চাহিয়াছিলে, এইক্ষণ তাহাই কহিতেছি। যে সকল পীড়া দ্বারা স্ত্রী, পুরুষ,

যুবক, যুবতী সকলেই সর্ব্বদা আক্রান্ত হইয়া থাকে, সেই সকল পীড়া ভিন্ন শিশুদিগের আরও কতকগুলি বিশেষ পীড়া আছে। কেবলমাত্র প্রসূতি বা ধাত্রীর কদাচার হইতেই তৎসমস্তের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শিশুদিগের পীড়া হইলে তাহারা বাক্য দ্বারা শরীরের অবস্থা ব্যক্ত করিতে পারে না, সুতরাং তাহা নির্ণয় করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা বড়ই কঠিন এবং বিবেচনা-সাপেক্ষ। তবে ক্রন্দনের তারতম্যানুসারে বেদনার আধিক্য ও অল্পতা অনুমান করিয়া লইতে হয়। দুগ্ধজীবী শিশু পীড়িত হইলে অনেক স্থানে প্রসূতি বা স্তন্যদায়িনী ধাত্রীকে লঙ্ঘনাদি নিয়মের অনুবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে হয়। আবার সময় সময় স্তন্যশোধক ঔষধও সেবন করা কর্ত্তব্য। কেননা অশুদ্ধ স্তন্যই শিশুদিগের রোগোৎপত্তির প্রধান কারণ। প্রথমতঃ নাড়ীকাটাসম্বন্ধীয় পীড়ার কথা কহিতেছি।

নাড়ীকাটাসম্বন্ধীয় পীড়া।

নাভি একটী সদ্য প্রাণনাশক শিরামর্ম্ম। ইহা হইতে চতুর্ব্বিংশতিটী ধমনী সমুত্থিত হইয়া চতুঃপার্শ্বে বিস্তৃত হইয়াছে। সেই সকল ধমনীর সহিত আপাদ-মস্তকস্থিত স্নায়ুমণ্ডলী ও প্রত্যেক লোমকূপের অতি

নৈকট্য সম্বন্ধ আছে। তদ্দারা জীবদিগের বাক্যকথন অঙ্গসঞ্চালন ও শরীরের কান্তি বৃদ্ধি হয়। যদি এই মর্ম্ম কোনরূপে আহত হয়, তবে জীবের জীবনাশা কোথায়? তাদৃশ দেহ বিনষ্ট হওয়াই স্থিরসিদ্ধান্ত। কিন্তু আহত হইবার তারতম্যানুসরে অবস্থাভেদে দুই এক জন অতিকষ্টে আরোগ্য লাভ করিলেও করিতে পারে। ইহারই বহির্ভাগকে সদ্যপ্রসূত সন্তানের নাভিরজ্জু কহে। যদি সেই রজ্জু গোড়া ঘেঁসিয়া, ঘষিয়া ঘষিয়া, অসমান করিয়া অথবা যাহাতে মর্ম্ম স্থানে বিশেষরূপে আঘাত লাগে, এরূপ করিয়া ছেদন করা যায়, তবে সেই সন্তানের মঙ্গল কামনা বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? নাড়াকাটাদোষেই প্রসূত বালকের নাভিমর্ম্মে প্রথমতঃ ভয়ানক শোথ জন্মে। কাহারও বহির্ভাগে শোথের কোন স্পষ্টতর লক্ষণ দৃষ্টিভূত না হইলেও অভ্যন্তরস্থ মর্ম্মস্থান সাতিশয় নিপাড়িত হইয়া থাকে। পরে তাহা আরও স্ফীত হইয়া উল্লিখিত ধমনী ও স্নায়ু-সমূহকে আক্রমণ করে, তাহাতে পাচক ও রঞ্জক পিত্তের ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠে এবং ব্যান বায়ুর গতিরোধ হওয়ায় রস রক্তাদি সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চালিত হইতে পারে না। ইহাতেই বালকের বর্ণ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির গঠন নিতান্ত বিকটাকার হইয়া পড়ে। মুহুর্মুহুঃ বর্ণের পরিবর্ত্তন হয়। আক্ষেপাদি উপদ্রব সমূহ উপস্থিত হইয়া ক্রময

সময় বালককে ধনুকাকারে নমিত করে। বায়ুর ভাবান্তর বশতঃ অথবা তীব্র যন্ত্রণায় অবিরত কণ্ঠ হইতে শ্রুতিকটু শব্দ সমূহ নির্গত হইতে থাকে। মাড়িদ্বয় দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ হয়, সুতবাং বালক স্তন্য পান করিতে পারে না। আবার নাভি-মর্ম্মের অব্যবহিত নিম্নে বস্তিমর্ম্ম নামে আরও একটী মর্ম্ম আছে, উহাও আক্রান্ত হইলে বালকের মল মূত্রাদির ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠে। এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া অজ্ঞ লোকেরা ভূত, প্রেত প্রভৃতির দৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া, সেই ক্ষণ-ভঙ্গুর জীবতরিকে আরও ক্ষণ-ভঙ্গুব কবিয়া, কাণ্ডারী-বিহীন কাষ্ঠতরীর ন্যায় দুস্তর সংসার-সমুদ্রে অকালে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে। ফলতঃ উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত লোক দ্বারা চিকিৎসা করাইলে তাদৃশ অবস্থাপন্ন সকল বালকেরই যে জীবন বক্ষা হইবে, এমন কোন কথা নাই। মর্ম্মস্থান গুরুতররূপে পীড়িত হইলে কেহই তাহাকে বাঁচাইতে পারিবে না। আবার মর্ম্মস্থানের অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল থাকিলে বিচক্ষণ লোকের চিকিৎসা কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না। তবে কে বাঁচিবে, কে মরিবে, কে কি পরিমাণে আহত হইয়াছে, কিরূপেই বা কার নাড়ী কাটা হইয়াছে, ইত্যাদি বিষয় চিকিৎসক ভিন্ন সাধারণ লোকদিগের পক্ষে বুঝিয়া উঠাও অসম্ভব। সুতরাং পীড়া যে প্রকাবই হউক না কেন, চিকিৎসকের

দ্বারা তাহার চিকিৎসা করাই যুক্তিসঙ্গত! দানবারি ওঝাদিগের উপর নির্ভর করিয়া থাকা বুদ্ধিমান লোকেব কর্ত্তব্য নহে। এই পীড়া সচরাচর নাড়ীকাটার পর হইতে ছয় দিনের মধ্যেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু ইহার পরিণামফল বিলম্বেও হইতে পারে। কেহ কেহ আবার এই পীড়াকে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া উত্তণ্ডিতা, পিণ্ডালিকা, বিনামিকা ও বিজৃম্ভিকা এই চারিটী নাম প্রদান করিয়া থাকে, ফলতঃ ইহাকে যিনি যত ভাগেই কেন বিভাগ করুন না, সমস্তেরই নিদান এবং চিকিৎসা একই রূপ। সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর বিশেষ করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

চিকিৎসা।—নাভিতে শোথ হইলে কোন মৃত্তিকা-পিণ্ড অগ্নিতে তপ্ত করিয়া প্রথমে দুগ্ধমধ্যে নিক্ষেপ করিবে এবং পরে কিঞ্চিৎ উষ্ণাবস্থায় তদ্দ্বারা নাভিতে স্বেদ প্রদান করিবে। ইহাতে নাভির শোথ এবং বেদনাদি নিবারিত হয়। নাভিপাকে হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ তৈল মাখাইবে। অথবা ঐ সকল বস্তুর চূর্ণ দ্বারা নাভি ব্যাপ্ত করিবে। উহা বিশেষ উপকারক। পীড়া কঠিন হইলে যে যে উপদ্রব উপস্থিত হয়, তত্তৎরোগাধি-কারোক্ত মৃদুবীর্য্য ঔষধসমূহ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। সেই সকল ঔষধ এবং যে যে অবস্থায় তাহা

নিতান্ত উপযোগী, তৎসমুদায় ভিন্ন ভিন্ন রোগাধিকারে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। মূল ব্যাধি এবং তাহার উপদ্রবাদি এক সঙ্গেই শীঘ্র শীঘ্র নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবে। নতুবা সেই কোমল মাংস-পিণ্ডের জীবনী-শক্তি রক্ষা করা বড়ই কঠিন। সকল প্রকার বর্ণবৈষম্য, আক্ষেপ, গাত্রকম্পন ও হিক্কা প্রভৃতি দূরীকরণার্থ বায়ুচ্ছায়া সুরেন্দ্র তৈল অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই তৈল নাভির চতুঃপার্শ্বে এমন ভাবে প্রলিপ্ত করিয়া রাখিবে যে, ইহা অনায়াসে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন মস্তক, কণ্ঠ, চক্ষু এবং বস্তি স্থানেও এই তৈল মাখাইবার নিয়ম আছে. এক্ষণে গ্রহদোষ-জনিত পীড়ার বিষয় কিঞ্চিৎ কহিতেছি।

গ্রহদোষজনিত পীড়া।

প্রসূতি বা ধাত্রীর অশুচি ব্যবহার এবং সূতিকা ঘর বা নবপ্রসূত সন্তানকে সর্ব্বদা অপরিষ্কার রাখিলে স্কন্দাদি গ্রহগণ কুপিত হইয়া শিশুর নানা প্রকার পীড়া উৎপাদন করে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ কুপিত হইলে শিশুর যে যে প্রকার অবস্থা দৃষ্ট হয়, প্রথমে তাহাই বলা যাইতেছে ; যথা,—

স্কন্দ গ্রহ।—এই গ্রহ কুপিত হইলে বালকের এক চক্ষু হইতে স্রাব নির্গত হয়, গাত্রে ঘর্ম্ম, স্পন্দন ও কম্পন উপস্থিত হয়, দৃষ্টি উর্দ্ধগামী, মুখ বক্র, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ এবং শরীরে অত্যন্ত রক্ত গন্ধ হয়। শিশু অবসাদযুক্ত হইয়া স্তন্যপানে বিরত হয় এবং অল্প অল্প রোদন করে।

স্কন্দাপস্মার।—এই গ্রহ দেহে প্রবেশ করিলে শিশু জ্ঞানশূন্য হইয়া মুখ হইতে ফেণা নির্গত করে। অথবা সজ্ঞানে থাকিয়া অতিশয় রোদন করে। শরীরে পূঁয এবং রক্ত গন্ধ হয়।

শকুনী।—এই গ্রহ কুপিত হইলে বালকের দেহ শিথিল, বেদনাযুক্ত ও মাংস ভোজী পক্ষীর ন্যায় বিস্র-গন্ধ হয়। সর্ব্বাঙ্গে দাহ, পাক ও স্রাবযুক্ত পীড়কা এবং স্ফোটক নির্গত হয়। আরও শিশু ভীত হইয়া সর্ব্বদা কাঁপিয়া উঠে।

রেবতী।—ইহা দ্বারা অভিভূত হইলে শিশুদিগের শরীর পঙ্ক-গন্ধ-বিশিষ্ট এবং ব্রণ ও স্ফোটক দ্বারা আচিত হয়। ঐ সকল ব্রণ ও স্ফোটক হইতে রক্ত নির্গম, দ্রব মলরেচন, জ্বর, দাহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

পূতনা।—ইহা দ্বারা বালকের অতীসার, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, বক্রদৃষ্টি, রোদন, অনিদ্রা এবং চিত্তের উদ্বিগ্নতা উপস্থিত হয়।

অন্ধ পূতনা।—এই গ্রহ কুপিত হইলে শিশুর প্রবল

জ্বর, কাস, তৃষ্ণা, দুগ্ধপানে বিদ্বেষ, বমন, অতীসার, অতিশয় রোদন এবং গাত্রে চর্ব্বির ন্যায় গন্ধ হয়।

শীত পূতনা।—ইহাতে কম্প, কাস, দুর্ব্বলতা, বমন, অতীসার ও নেত্ররোগ উৎপন্ন হয়।

মুখমুণ্ডিকা।—এতদ্দ্বারা আক্রান্ত হইলে শিশুর বদনমণ্ডল প্রসন্ন ও শিরা দ্বারা আবৃত হয়, দেহে মূত্রগন্ধ এবং আহার অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

নৈগমেয় বা পিতৃগ্রহ।—কণ্ঠ ও মুখশোষ, উৰ্দ্ধ দৃষ্টি, বমন, ঈষৎ কম্প, আক্ষেপ, মূর্চ্ছা, দেহের দৌর্গন্ধ্য এবং দন্ত কড়মড়ি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।—উপরোক্ত লক্ষণ দ্বারা যে গ্রহের প্রকোপ বুঝিবে, সেই গ্রহ শান্তির জন্য প্রথমতঃ তন্ত্রবিৎ পুরোহিত আনাইয়া যথাবিধি পূজা ও হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে। সেই সকল পূজার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। পুরোহিত গণই তাহা আবশ্যকমত তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া লইবেন। পরিশেষে জ্বর, অতীসার, তৃষ্ণা ও বমি প্রভৃতি নিবারণের জন্য তত্তৎ রোগাধিকারোক্ত ঔষধ সমূহ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। অচিরজাত শিশু যদি স্তন্যপান না করে, তাহা হইলে আমলকী ও হরীতকী উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধুর সহিত মিশাইয়া তদ্দ্বারা বালকের জিহ্বা ঘর্ষণ করিবে।

মাড়িদ্বয় আবদ্ধ হইয়া থাকিলে ঈষদুষ্ণ ঘৃতের সহিত অত্যল্প ত্রিকটুচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ মধু নিক্ষেপ করিবে, এবং অঙ্গুলি দ্বারা বালকের মাড়িতে ঘর্ষণ করিবে। অথবা শুদ্ধ ঘৃত দ্বারাও উপকার হইতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধ হইলে বকুল ফল ও পানের বোঁটা গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ করিলে শীঘ্র উপকার হয়। সাপের খোসা, রশুন, মুগরামূল, সর্ষপ, নিমের পাতা, বিড়ালের বিষ্ঠা, ছাগলোম, মেষলোম, বচ ও মধু এই সমুদায় একত্রে মিশ্রিত করিয়া তাহার ধূপ প্রদান করিলে শিশুর জ্বর ও গ্রহাদির শান্তি হয়। গ্রহদোষজনিত পীড়া সমূহ উপশম হইলে, মুরামাংসী, জটামাংসী. বচ, কুড়, শৈলজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শটী, চম্পক ও মুথা এই কয়েকটী পদার্থ ভিজাইয়া সেই জলে বালককে স্নান করাইবে। ইহাদিগকে সর্ব্বৌষধি বলে। ইহাতে স্নান করাইলে বালকের ব্যাধিনিবৃত্তি, গ্রহাদির শান্তি, আয়ুর্ব্বৃদ্ধি ও লাবণ্যোৎপত্তি হয়। কুড়, বচ, হরীতকী, ব্রহ্মী-শাক ও অত্যল্প পরিমাণে ধুতূরামূল চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত বালককে অবলেহন করাইলে বর্ণ, কান্তি, ও আয়ু বৃদ্ধি হয়।

পশ্চাকজ।

এই পীড়া কেবল বালকদিগেরই হইয়া থাকে। ইহা অতিশয় কষ্টদায়ক। মাতার কদন্নাদি ভোজনজন্য বিকৃত স্তন্যপানে শিশুর দেহস্থ পিত্ত কুপিত হইয়া গুহ্য-দেশে উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারা ঐ স্থানে জোঁকের উদর-সদৃশ এক প্রকার ব্রণ উৎপন্ন হয়। ইহাতে গুহ্যদেশে দাহ ও উত্তাপ, মল হরিত বা পীতবর্ণ এবং প্রবল জ্বর হয়।

চিকিৎসা।—পঞ্চারুজ রোগে রক্তচন্দন, অনন্তমূল, শ্যামালতা, চোরকাঁচ্‌কী, এই সমুদায়ের প্রলেপ ও অব-লেহ প্রশস্ত। কাঁকড়াশৃঙ্গী, আতইচ, শুঁঠ, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বালা, মুথা, কুলআটীর শস্য, এই সমুদায় পেষণ করিয়া মধুসংযোগে অবলেহ প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করাইলে বালকের জ্বর, অতীসার, দুর্ব্বার গ্রহণী, বমি, রক্তস্রাব, শ্বাস, কাস ও পশ্চারুজ রোগ প্রশমিত হয়। বালকের গুহ্যপাকে পিত্তঘ্ন ক্রিয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে রসোতের প্রলেপ দেওয়া এবং তাহা সেবন করান বিশেষ হিতজনক।

মহাপদ্ম।

ইহা ত্রিদোষোদ্ভব প্রাণনাশক এক প্রকার পীড়কা। রক্তবর্ণ পদ্মের ন্যায় দেখা যায় বলিয়া মহাপদ্ম নামে

অভিহিত হইয়াছে। এই পীড়া প্রথমতঃ মস্তকে প্রকাশিত হইয়া শঙ্খদেশ দিয়া হৃদয় এবং তথা হইতে গুহ্যদ্বারে বিসর্পিত হয়। আবার ইহার বিপরীত ভাবেও প্রকাশিত হইতে পারে (অর্থাৎ প্রথমে গুহ্যদেশ হইতে উল্লিখিত স্থান প্রভৃতিতে)। কেহ কেহ ইহাকে বাল-বিসর্পও কহিয়া থাকেন।

চিকিৎসা।—মহাপদ্ম রোগের দোষশান্তির জন্য পল্‌তা, নিম, দারুহরিদ্রা, কট্‌কী, যষ্টিমধু এবং বলালতা, ইহাদিগের ক্বাথ পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। কিস্‌মিস্‌, ক্ষেতপাপড়া, শুঁঠ, গুলঞ্চ এবং দুরালভা এই সমুদায় কুট্টিত করিয়া এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতঃকালে তাহা ছাকিয়া পান করাইবে। ঘৃত ও মধুর সহিত ময়দা মিশ্রিত করিয়া পীড়িত স্থানে প্রলেপ দিলে শীঘ্র উপকার হয়। এক প্রলেপের উপর আবার প্রলেপ দেওয়া উচিত নহে। পূর্ব্ব প্রলেপ পরিষ্কার করিয়া আবার দিতে হইবে। যদি পীড়িত স্থান পাকিয়া ক্ষত হয়, তাহা হইলে দুর্ব্বার স্বরসের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তদ্দ্বারা পটী দিবে।

তালুকণ্টক।

বিকৃত কফ সঞ্চিত হইলে শিশুদিগের তালুমাংসে এই পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাতে মস্তক

বসিয়া যায়, এবং শিশু স্তন্যপান করিতে পারে না, বহু কষ্টে পান করিলেও তাহা বমন হইয়া পড়িয়া যায়। তরল ভেদ, তৃষ্ণা এবং কণ্ঠ, চক্ষু ও মুখ প্রভৃতি স্থানে বেদনা হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—হরীতকী, বচ ও কুড় এই সমুদায় একত্রে বাঁটিয়া মধু ও স্তনদুগ্ধের সহিত পান করাইলে শিশুর তালুপাত নিবারণ হয়। আমের কুশি, জারিত লৌহ, গেঁরিমাটি, মধু ও রসোত একত্রিত করিয়া সেবন করাইবে। দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, হরীতকী ও জাতীপত্র একত্রে বাটিয়া মধুর সহিত তালুতে প্রলেপ দিলেও সবিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়।

কুকূণক।

ইহা এক প্রকার চক্ষুরোগ। বিকৃত স্তন্যপান করিলে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে চক্ষে বেদনা, কণ্ডু ও উহা হইতে অবিরত স্রাব নির্গত হইয়া থাকে। শিশু সর্ব্বদা কপাল, চক্ষু ও নাসিকা ঘর্ষণ করে এবং সূর্য্যকিরণ দর্শন বা চক্ষের পাতা উন্মীলন করিতে পারেনা।

চিকিৎসা।—হরীতকী, আমলা, বহেড়া, লোধ, পুনর্ণবা, শুঁঠ, বৃহতী ও কণ্টকারী, এই সকল জলে বাঁটিয়া অল্প উষ্ণ করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে কুকূণক রোগের শান্তি হয়। দারুহরিদ্রা, মুথা ও গেরিমাটি, ছাগদুগ্ধের

সহিত পেষণ করিয়া চক্ষের বহির্ভাগে প্রলেপ দিবে। মনছাল, শঙ্খনাভি, পিপুল ও রসাঞ্জন মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জনে বালকের সকল প্রকার চক্ষের পীড়া উপশমিত হয়।

অজগল্লী।

ইহা মুগের ন্যায় স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, গ্রথিত ও বেদনাশূন্য এক প্রকার পীড়কা। বয়োধিকাবস্থায় কখনও এই পীড়া হয় না।

চিকিৎসা।—এই রোগ দীর্ঘকালোত্থিত এবং অত্যন্ত কঠিন হইলে ক্ষারযোগে তাহা বিদীর্ণ করিবে। বাসক-মূল ও রাখাল সসার মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে সবিশেষ উপকার হইয়া থাকে। তরুণ কণ্টকারী বৃক্ষের কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করিলে উহা পাকিয়া শীঘ্র প্রশমিত হয়।

অহিপূতন।

অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইয়া বা সর্ব্বদা মলমূত্র লাগিয়া শিশু-দিগের মলদ্বার নিরন্তর অপরিষ্কার থাকিলে উহাতে রক্তকফোদ্ভব একপ্রকার কণ্ডু জন্মে। সেই কণ্ডু চুল-কাইয়া দিলে সহসা স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া স্রাবনির্গত হয়, এবং ক্ষতসমূহ একত্রে মিলিত হইয়া যায়। এই পীড়াকে অহিপূতন কহে।

চিকিৎসা।—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও খদিরের ক্বাথ দ্বারা বারম্বার ক্ষত ধৌত করিলে শীঘ্র পীড়ার শান্তি হয়। করঞ্জবীজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও তিক্ত দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবে।

ক্ষীরছর্দ্দি।

স্তন্যপান করিবামাত্রেই যদি বমি হইয়া তাহা পড়িয়া যায়, তবে তাহাকে ক্ষীরছর্দ্দি কহে। আবার গব্য দুগ্ধ পান করিলেও এরূপ হইয়া থাকে। চলিতভাষায় ইহাকে দুধতোলা কহে। এই পীড়ায় অনিষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

চিকিৎসা।—বৃহতী ও কণ্টকারী ফলের রস পান করাইলে দুগ্ধবমন নিবারিত হয়। পঞ্চকোলের অবলেহদ্বারাও পীড়া উপশমিত হইয়া থাকে। দুগ্ধের সহিত প্রত্যহ ৩।৪ বার করিয়া ৪।৫ বিন্দু মাত্রায় চূণের জল সেবন করাইলে দুধতোলা নিবারণ হয়। আমের-কুসি, খই এবং সৈন্ধব লবণ, এই তিনটী দ্রব্য উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া সমভাগে মধুর সহিত অবলেহন করিতে দিবে। উদরের পীড়া বর্ত্তমান থাকিলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। পিপুল ও মরিচচূর্ণ, চিনি, মধু ও ছোলঙ্গলেবুর

রসের সহিত সেবন করাইলে বালকের হিক্কা ও বমি নিবারণ হয়।

জ্বর।

বালকদিগের যে কোন পীড়াই হউক না কেন, তাহার সঙ্গে কিছু না কিছু জ্বর সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু সেই জ্বর যদি অন্য কোন পীড়ার উপসর্গ না হইয়া স্বতন্ত্ররূপে বালকদিগকে আক্রমণ করে, তবে প্রায়ই তাহা গুরুতর আকার ধারণ করিয়া থাকে। দুগ্ধজীবী শিশুদিগের দেহে অন্যান্য দোষ অপেক্ষা বাতশ্লেষ্মা স্বভাবতঃই একটু প্রবল, আবার কাহারও বা ক্রিমিদোষও বিদ্যমান থাকে, তাহাতেই এরূপ হয়। শিশুদিগের জ্বর হইলে সাধারণতঃ শ্বাস, কাস, শরীরের উত্তাপ এবং বমি প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। জ্বরের বেগ যদি অত্যন্ত বেশী হয়, তবে সেই জ্বর পরিত্যাগ হইবার সময় কোন কোন শিশুর মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। চক্ষুদ্বয় ঘূর্ণায়মান বা স্থিরভাব প্রাপ্ত হইয়া উর্দ্ধগামী হয়, অঙ্গসমূহ নিস্পন্দ হইয়া দুর্ব্বলের ন্যায় ঢলিয়া পড়ে বা অঙ্গবিশেষের খেঁচুনী আরম্ভ হয়, ক্রমে ক্রমে শ্বাস অবরুদ্ধ হইয়া আইসে, এবং মুখশ্রীর সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য (নীলবর্ণত্ব) হওয়ায় বোধ হয়, যেন বালকের জীবনকাল পর্য্য-

বসিত হইল। সামান্য ভাষায় ইহাকে জ্বরচোমক কহে।*

চিকিৎসা। দুগ্ধজীবী শিশুর পক্ষে লঙ্ঘনাদি ব্যবস্থেয় নহে। শিশুর অপর সমস্তই নিষেধ করা যাইতে পারে, কিন্তু কখনও স্তন্য বারণ করা যাইতে পারে না। স্তন্য-দায়িনীকেই অনেক সময় উপবাসাদি নিয়মের অধীন হইযা ঔষধ সেবন করিতে হয়। স্তন্য দূষিত হইলে প্রথমে তাহাই সংশোধন কবিয়া লইবে। স্তন্যশোধক ঔযধাদিব বিষয় স্তন-বোগাধিকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মুথা, হরীতকী, নিমছাল, পটোলপত্র, যষ্টিমধু, এই সমুদায়ের ক্বাথ ঈষদুষ্ণ অবস্থায় শিশুকে পান করাইবে। শিশু ঔযধ সেবন করিতে অনিচ্ছুক হইলে ঔষধীয় কল্ক স্তন্য-দায়িনীর স্তনে লেপন করিয়া দিবে। সেই স্তন্য পান করিলেও বালকের উপকার হইতে পারে।

মৌরী, পিপুল, রসোত, খইচূর্ণ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মরিচ, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে বমি, কাস ও জ্বর নিবারণ হয়।

কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুথা, আতইচ সমভাগে চূর্ণ করিয়া অথবা কেবল আতইচচূর্ণ মধুর সহিত অবলেহন করাইলে কাস, জ্বর ও বমি নিবারণ হয়।

নাটার বীজ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তৎপরিমিত মরিচ-

* ডাক্তারগণ ইহাকে Convulsion of the Infant কহেন।

চূর্ণ তাহার সহিত মিশাইয়া লইবে। কিঞ্চিৎ মধু বা স্তন্যদুগ্ধের সহিত ইহার অর্দ্ধ রতি করিয়া দিনের মধ্যে ৩।৪ বার সেবন করাইলে অতি আশ্চর্য্যরূপে দীর্ঘকালোত্থিত শ্বাস, কাস ও উপদ্রবসহিত প্রবল জ্বর উপশমিত হয়।

এতদ্ভিন্ন আবশ্যক হইলে, রসাদিও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বালরোগান্তক রস ও রামেশ্বর রস শিশুদিগের পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ। জ্বরের বলাবল বিবেচনা করিয়া দিনের মধ্যে ২।৩ বা ৪টী বটী চারি বারে সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান পিপুল বা মরিচচূর্ণের সহিত মধু অথবা শুদ্ধ মধু বা স্তনদুগ্ধ।

বালরোগান্তক রস।—শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক, প্রত্যেকে ৷৷০ তোলা, জারিত স্বর্ণমাক্ষিক ২ মাষা, একত্রে উত্তমরূপ কজ্জলী করিয়া লৌহপাত্রে কেশরাজ, ভীমরাজ এবং নিসিন্দার স্বরসে তিন বার করিয়া ভাবনা দিয়া সষপাকার বটী প্রস্তুত করিবে। তরুণ জ্বরে শ্বাস কাসাদি উপদ্রব না থাকিলে ইহা প্রশস্ত।

রামেশ্বর রস।—শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক, জারিত স্বর্ণমাক্ষিক, প্রত্যেকে এক তোলা পূর্ব্ববৎ কজ্জলী করিয়া লৌহপাত্রে কেশরাজ, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, কাকমাচী, গিমা, হুড়হুড়া, সালিঞ্চা, থানকুনি (থুলকুড়ি) ইহাদের প্রত্যেকের রসে যথাক্রমে ভাবনা দিয়া মরি

৷৹ তোলা, শ্বেত অপরাজিতা ফুলের মূল ৷৹ তোলা, মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। এবং সর্ষপের ন্যায় বটী প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুখাইয়া লইবে। শ্বাস, কাস ও হিক্কা সংযুক্ত প্রবল জ্বরে বালকদিগের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। এতদ্ভিন্ন সাধারণ জ্বরাধিকারে যে সকল ঔষধের কথা উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যেও বিবেচনা করিয়া কোন কোন মৃদুবীর্য্য ঔষধ সূক্ষ্মমাত্রায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

কণ্টকারী ঘৃত।—ঘৃত /৪ সের। কণ্টকারী, বৃহতী, ভামোট (ইহার সংস্কৃত নাম ভার্গী), বাসকছাল ইহাদের রস বা ক্বাথ প্রত্যেকে /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ গজপিপুল, পিপুল, মরিচ, যষ্টিমধু, বচ, পিপুলমূল, জটামাংসী, চই, চিতামূল, রক্তচন্দন, মুথা, গুলঞ্চ, শ্বেতচন্দন, যমানী, জীরা, বেড়েলা, শুঁঠ, কিস্‌মিস্‌, দাড়িম ফলের খোসা, দেবদারু মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া বয়ঃক্রমানুসারে এক হইতে চারি আনা মাত্রায় ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত শিশুকে সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা শ্বাস, কাস, জ্বর, অরুচি, শূল ও কফের শান্তি এবং বল ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়। যে জ্বর কিছুতেই উপশমিত না হয়, সেইরূপ অবস্থাতেই ইহা প্রয়োগ করিতে হয়। জ্বরের তরুণাবস্থায় প্রয়োগ করা উচিত নহে।

লাক্ষাদি তৈল।—মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ সের, লাক্ষার ক্বাথ /৪ সের, দধির মাত ।৬ সের ; কল্কার্থ রাস্না, রক্তচন্দন, কুড়, মুথা, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শুল্‌ফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, মুগরামূল, কট্‌কী ও রেণুকা মিলিত /১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে বালকদিগের জ্বরাদি উপশম ও বলবৃদ্ধি হয়। *

ব্যাঘ্রীতৈল।—মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ সের, কণ্টকারী, বাসক, বেলশুঁঠ ও কেশুরিয়ার রস প্রত্যেকে /৪ সের ; কাঁজি /৪ সের ; কল্কার্থ মুথা, মোচরস, রসাঞ্জন, শুল্‌ফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, বেড়েলা, রাস্না, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকেশর, শালপাণি, চাকুলে, গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর ও বালা মিলিত /১ সের। নিমকাষ্ঠের অগ্নিতে মৃত্তিকাপাত্রে যথাবিধি তৈল পাক করিবে। ইহা মর্দ্দন করিলে বালকদিগের শ্বাস, কাস, জ্বর, অগ্নিবিকৃতি ও বিবিধ ত্বক্‌পীড়া উপশমিত হয়।

জ্বরাতিসার।

কখন কখন বালকদিগের জ্বরের মধ্যে নানাবর্ণের তরল মল-ভেদ হইয়া থাকে। তদ্রূপ অবস্থায় শিশু

---

* আজকাল কুইনাইনসেবী বালকদিগকে তৈল মর্দ্দন করিতে দিলে জ্বরের বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়।

পেটের বেদনায় বড়ই অস্থির হয়। ইহা নিতান্ত দুশ্চিকিৎস্য।

চিকিৎসা।—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কণ্টকারী, ইন্দ্রযব মিলিত ২ তোলা, জল ।৷৹ সের, শেষ ৵৹ ছটাক। এই ক্বাথদ্বারা শিশুর স্তন্যদোষ নিবারিত ও জ্বরাতিসার উপশমিত হয়। আবশ্যক হইলে স্তন্যদায়িনীকেও ইহা সেবন করিতে দেওয়া যায়। মুথা, পিপুল, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত সংযুক্ত করিয়া সেবন করাইলে শিশুর জ্বরাতিসার, শ্বাস, কাস ও বমি নিবারণ হয়। ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনিয়া, লোধ, ইন্দ্রযব, বালা, সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত সেবন করাইলে বালকদিগের জ্বরাতিসার ও বমন নিবারণ হয। হরিদ্রা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গজপিপুল, বৃহতী, কণ্টকারী, চাকুলে, শুল্‌ফা. প্রত্যেকে সমভাগে চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহন করাইলে বালকের জ্বরাতিসার প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। পশ্চাল্লিখিত পারিগর্ভিক রোগাধিকারোক্ত কুমার-কল্যাণ-রস অবস্থানুসারী অনুপানের সহিত সেবন করাইলে এই পীড়ায় বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়। জ্বরচোমক বা তড়কার সময় শিশুর যে ভয়ানক অবস্থা হইয়া থাকে, তজ্জন্য বিশেষ কোন ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় না। জ্বরের বেগ লাঘব হইয়া আসিলে আর কখন সেইরূপ ভাব

উপস্থিত হয় না। তবে নিতান্ত বেগতিক দেখিলে চক্ষে, মুখে বা মস্তকে শীতল জলের ছিটা দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু উহা উপশমিত হইলে আর শীতক্রিয়া কর্ত্তব্য নহে। ঘোরতর বৈকারিক লক্ষণ লক্ষিত হইলে কিঞ্চিৎ মকর-ধ্বজ চটী অতি অল্পমাত্রায় মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া বালককে অবলেহন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে ক্রিমিদোষেরও লাঘব হয়।

ক্রিমিদোষ।

যদি এলো মেলো রূপে জ্বরের বেগ হয়, অর্থাৎ জ্বর আসিবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় না থাকে, অথবা কখনও অল্প, কখনও বা অধিক পরিমাণে জ্বরের বেগ হয়, নাসা-রন্ধ্রে কফ জমাট হইয়া না থাকিলেও বালক অবিরত হস্তদ্বারা নাসিকা ঘর্ষণ করে, তীব্র পেটের বেদনায় একবারে অস্থির হয়, এবং বেদনার সহিত অল্প অল্প পাতলা মলভেদ হয়, তবে ক্রিমিজনিত পীড়া বলিয়া স্থির করিবে। ক্রিমিদোষ বিদ্যমান থাকিলে কদাচিৎ জ্বরের বিচ্ছেদ লক্ষিত হয়। এরূপ অবস্থায় জ্বরনাশক ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিমিঘ্ন ঔষধও প্রয়োগ করিতে হয়। প্রথমে মধুর সহিত কিঞ্চিৎ রসসিন্দুর ঘষিয়া পরে ঈষদুষ্ণ সুপারি-মূলের রস তাহার সহিত মিশাইয়া লইবে। এই ঔষধ

পান করাইলে জ্বরের বেগ হ্রাস হয়, এবং ক্রিমিদোষও নিবারিত হয়। আরও নাড়ী চৈতন্য রাখিবার ক্ষমতাও ইহার বিলক্ষণ আছে। জয়ন্তীপত্রদ্বারা রুটীর ন্যায় প্রস্তুত করিয়া নাভির উপর স্থাপন করিলে বা হিঙ্গুদ্বারা ঐ স্থানে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়। তলপেটে তার্পিন তৈল মর্দ্দন করিবারও নিয়ম আছে। দাড়িমের খোসা, সুপারীমূল একত্রে বাঁটিয়া তাহার রস কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া মধুর সহিত সেবন করাইলে বিস্তর উপকার হয়। মধুর সহিত বিড়ঙ্গচূর্ণ সেবন করাইলে ক্রিমি নষ্ট হয়। মুথা, ইন্দুরকানি, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সজিনার ছাল, দেবদারু, ইহাদের ক্কাথে পিপুল /০ আনা, বিড়ঙ্গ /০ আনা বাঁটিয়া মধ্যে মধ্যে সেবন করাইলে ক্রিমি ও ক্রিমিজন্য রোগ বিনষ্ট হয়। খোরাসানী যমানী, মুথা, পিপুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ ও আতইচ, এই সকল উত্তমরূপে চূর্ণ ও সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহাকে পারাসীয়াদি চূর্ণ কহে। এই চূর্ণ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মাড়িয়া বালককে একটু একটু সেবন করাইলে কাস, জ্বর, অতীসার ও বমি নিবারণ হয়, এবং কোষ্ঠস্থ ক্রিমিসকল বাতাহত কদলীর ন্যায় উন্মূলিত হইয়া যায়। যুবকগণও ইহা সেবন করিতে পারেন।

দুধপীলা।

বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের ন্যায় বালকদেরও পীলা হইয়া থাকে। সেই সঙ্গে জ্বর ও উদরের পীড়াও বর্ত্তমান থাকিতে পারে। ঔষধের মাত্রা বিবেচনা করিয়া সাধারণ বিধানমতেই তাহার চিকিৎসা করিবে। শামুকের মুখের মধ্যভাগ এবং মানকচুর শিকড় উত্তমরূপে পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ গোঁড়ালেবুর রসের সহিত সেবন করাইলে বালকদিগের দুধপীলার উপশম হয়।

অতীসার।

স্তন্য-পায়ী শিশুর আমাতিসারে প্রথমতঃ ধাত্রীর অর্থাৎ স্তন্যদায়িনীর উপবাস করা কর্ত্তব্য। অথবা পঞ্চ-কোল সিদ্ধ পেয়াদিও পান করিতে দেওয়া যায়। বচ, মুথা, দেবদারু, শুঁঠ ও আতইচ, ইহাদিগকে বচাদি গণ এবং হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, বৃহতী ও ইন্দ্রযব, এই গুলিকে হরিদ্রাদি গণ কহে। এই উভয় গণ স্তন্য-শোধক, আমাতীসারনাশক, কফঘ্ন ও মেদশোধক। ইহাদের ক্বাথ শিশুর স্তন্য-দায়িনীকে এবং সম্ভব হইলে শিশুকেও সেবন করাইবে। শিশুর অতীসারের আমাবস্থা শুষ্ক হইলে ধাত্রীর পিপুলচূর্ণের সহিত মাষ-কলায়ের যূস পান করা কর্ত্তব্য। মুথা, আতইচ, শুঁঠ,

বালা, ইন্দ্রযব। বেলশুঁঠ, ধাইফুল, বালা, লোধ, গজ-পিপ্পলী। বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ, অনন্তমূল। যথাবিধি ইহাদের কোন একটী যোগের কাথ প্রস্তুত করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত ধাত্রী ও শিশুকে সেবন করাইলে সকল প্রকার অতীসার উপশমিত হয়।

শিশু ঔষধ সেবন করিতে অসমর্থ হইলে কুল, আম-রুল, কাকমাচী ও কয়েতবেল, ইহাদের যথাপ্রাপ্ত পত্র বাঁটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে। ইহাতে অতীসার ও বমি নিবারিত হয়। পেটারীমূল, আকনাদি মূল, জামছাল, আমছাল, এই সমুদায় পেষণ করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। ইহা হৃদয়, নাভি ও তালুতে ধারণ করিলে বমি ও অতী-সার বারণ হয়।

আমড়াছাল, আমছাল, জামছাল। অথবা প্রিয়ঙ্গু, কুলআঁটির শাস, মুথা ও রসোত। ইহাদিগের চূর্ণ সম-ভাগে মধুর সহিত শিশুকে অবলেহন করাইলে বমি, তৃষ্ণা ও অতীসার নিবারিত হয়। বিল্বমূলের কাথে খই ও চিনি গুলিয়া পান করাইলেও উপকার হইতে দেখা যায়।

প্রবাহিকা।

চলিত ভাষায় ইহাকে আমবিকার কহে। আমাশয়ে দোষ সঞ্চিত হইলে এই পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ইহাতে নাভির চতুঃপার্শ্বে এবং তলপেটে চাপ ধরিয়া অতিশয় বেদনা উপস্থিত হয়। মলত্যাগ করিবার সময়ও যারপর নাই যন্ত্রণা হইয়া থাকে। শ্বেতজীরা ও শ্বেতধুনা বিল্বপত্ররসে অথবা কেবল শ্বেতধুনা গুড়ের সহিত সেবন করাইলে বালকের আমরক্ত ও পেটের বেদনা নিবারিত হয়। মোচরস, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, পদ্মকেশর, ইহাদিগকে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা যবাগূ (তরল পানীয়) প্রস্তুত করিয়া শিশুকে পান করাইলে রক্তাতীসার প্রশমিত হয়। তিল, তিলতৈল, যষ্টিমধু, চিনি ও মধুর সহিত চাটাইয়া সেবন করাইলে রক্তস্রাব ও প্রবাহিকা নিবারণ হয়। খই, যষ্টিমধু, চিনি, মধু এই সমুদায় তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করাইলে শীঘ্র আমাশয়ের পীড়া নষ্ট হয়। হরিদ্রা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, বৃহতী, গজপিপ্পলী, শুল্‌ফা ইহাদের চূর্ণও প্রবাহিকানাশক।

গ্রহণী।

আঁকোড়মূল অথবা কুড়চিমূল চাউলধোয়া জলের সহিত বাটিয়া সেবন করাইলে অতীসার ও গ্রহণী রোগ নষ্ট হয়। মরিচ এক ভাগ, শুঁঠ দুই ভাগ, কুড়চিমূলের ছাল চারি ভাগ একত্রে পেষণ করিয়া গুড় ও তক্রের সহিত সেবন করাইলে গ্রহণীরোগের শান্তি হয়। বেল-

শুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মোচরস মিলিত করিয়া দুগ্ধ /।০ এক পোয়া, /১ এক সের জলে পাক করিয়া দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ বালককে পান করাইলে তিন দিবসের মধ্যে মাংস রক্তক্ষরণ সহিত প্রবল গ্রহণী নষ্ট হয়। ছাগদুগ্ধ ও জামছালের রস সমভাগে মিশ্রিত করিয়া শিশুকে পান করাইলেও উপকার হয়।

অজীর্ণ ও উদরাময়রোগগ্রস্ত বালকদিগের পক্ষে গব্য দুগ্ধ পান করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইহাতে আরও উদরের পীড়া বৃদ্ধি হয় এবং ক্রিমিদোষ জন্মে। সুতরাং ছাগদুগ্ধই তাহাদিগকে পান করিতে দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। দুগ্ধজীবী ও দুগ্ধান্নজীবী শিশুদিগের অজীর্ণ ও উদরাময় হইলে লবঙ্গচতুঃসম, দাড়িম্বচতুঃসম, বালকুটজাবলেহ ও বালচাঙ্গেরী ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা অতি সুন্দররূপ ফল পাওয়া যায়। কিন্তু অন্নজীবী শিশুদিগের সম্বন্ধে রামবান রস ও মহাগন্ধক প্রভৃতি ঔষধই উৎকৃষ্ট। দুগ্ধজীবী শিশুদিগের ঔষধগুলি প্রস্তুত করিবার নিয়ম এই ;—

লবঙ্গচতুঃসম।—জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা ও সোহাগার খই, এই দ্রব্যচতুষ্টয় উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। পরে ইহাদিগের সমভাগ একত্রে মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দিবে। চিনি ও মধুর সহিত

এই চূর্ণের কিঞ্চিৎ বালককে অবলেহন করাইলে আমাতিসার ও তজ্জনিত পেটের বেদনা নিবারিত হয়।

দাড়িম্বচতুঃসম।—উপরোক্ত বস্তুচতুষ্টয় একটী কাঁচা দাড়িম্বের মধ্যগত করিয়া পুটপাকের বিধানানুসারে পুট প্রদান করিবে। পরে ছাগদুগ্ধ বা জলের সহিত পেষণ করিয়া অর্দ্ধরতিমাত্রায় বটী প্রস্তুত করিবে। দুগ্ধজীবী শিশুর পক্ষে ইহার একটী করিয়া বটী এবং দুগ্ধান্নজীবী শিশুর বয়ঃক্রমানুসারে ২ হইতে ৪টী করিয়া বটী একবারে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অনুপান ছাগদুগ্ধ বা জল। বালকদিগের উদরাময়রোগে ইহা বিশেষ উপকারী।

বালকুটজাবলেহ।—কুট্টিত কুড়চিমূলের ছাল ৮ তোলা পরিমাণে ওজন করিয়া /১ এক সের জলে পাক করিবে। চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার চুল্লীর উপর স্থাপন করিবে এবং আতইচ, আকনাদি, জীরা, বেলশুঁঠ, আমেরকুই, শলুকা, ধাইফুল, মুথা, জায়ফল এই কয়খানি দ্রব্য চূর্ণ করিয়া এক একটী ।০ চারি আনা ওজনে তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। পরে উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া সাবধানে রাখিয়া দিবে। যাহারা তীব্র পেটের বেদনায় একবারে অস্থির হইয়া পড়ে এবং বাহ্যে যাইবার সময় যাহাদের রক্তমিশ্রিত মল বা শুদ্ধ রক্ত নির্গত হয়, তাহাদিগকে এই ঔষধ

দুই বেলা অবলেহন করিতে দিলে শীঘ্র উপকার হয়। ইহা বালকদিগের আমশূল ও রক্তস্রাবের মহৌষধ।

বালচাঙ্গেরী ঘৃত।—ঘৃত /৪ সের, আমরুলের রস /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ কয়েতবেল, পিপুল, মরিচ, শুঁঠ, সৈন্ধব, বরাক্রান্তা, উৎপল, বালা, বেলশুঁঠ, ধাইফুল, মোচরস মিলিত /১ সের। এই ঘৃত পান করিলে বালকের অতীসার এবং গ্রহণী প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

কাস।

এই পীড়া শিশুদিগের পক্ষে বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। প্রথমে সামান্য জ্বরের সহিত সর্দ্দি ও কাসি হইয়া পরে তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কাসিবার সময় শিশুর মুখমণ্ডল আরক্ত ও শরীর সম্মুখ দিকে বক্র হয়। কাহারও বা চক্ষুদ্বয় জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। শ্বাসগ্রহণকালে কণ্ঠ হইতে কুক্কুটধ্বনির ন্যায় শব্দ নির্গত হয়। শিশু স্তন্যপান করিতে পারে না।

চিকিৎসা।—অচিরজাত শিশুর কফ নিবারণার্থ ঈষদুষ্ণ পলাণ্ডুরস বা তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে। চিতামুল, শুঁঠ, দন্তীমূল, গবাক্ষীমূল একত্রে চূর্ণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করাইবে। ইহাতে বালকের শ্বাস, কাস ও হিক্কা নিবারণ হয়। কুড়,

আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল ও দুরালভা এই সমস্ত দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুর পঞ্চবিধ কাস প্রশমিত হয়। জ্বরের অত্যন্ত প্রকোপ থাকিলে পানের রসের সহিত স্বচ্ছন্দ ভৈরব সেবন করাইবে। কণ্ঠ হইতে অবিরত ঘড়ঘড়ি শব্দ নির্গত হইলে কণ্টকারী রস বা ক্বাথের সহিত অতি অল্প পরিমাণে মকরধ্বজচটী সেবন করাইবে। বৃহতী, কণ্টকারী, বাসক-ছাল ও কট্‌কী ইহাদের ক্বাথে কিঞ্চিৎ ঘৃতভর্জ্জিত হিঙ্গ ও কর্পূর অথবা কেবল নিশাদল ১ রতি পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। জ্বর না থাকিলে দ্রাক্ষা, দুরালভা, হরীতকী ও পিপুলচূর্ণ, ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করাইবে। ইহাতে কাস ও তমকশ্বাস নিবারিত হয়। বুকে শ্লেষ্মা চাপা ধরিয়া থাকিলে যখন নিশ্বাস ফেলিতে অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং পাঁজোরদ্বয় অবিরত আকর্ষিত হইতে থাকে, তখন ঈষদুষ্ণ খাসীর তৈল বুকে মর্দ্দন করিলে সবিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়। প্রথমে কিঞ্চিৎ হরিদ্রা জলে গুলিয়া পরে তন্মধ্যে অল্প পরিমাণে চূর্ণ ও লবণ নিক্ষেপ করিবে। ব্যঞ্জনের পাতিলে ইহাই জাল দিয়া শয়নের পূর্ব্বে গরম গরম সেবন করিলে একদিনেই বিস্তর উপকার হয়। আবালবৃদ্ধ সকলের পক্ষেই ইহা নিতান্ত উপযোগী।

শৈশব ধনুষ্টঙ্কার।

পীড়িতাবস্থায় দেহ ধনুকাকারে নমিত হয়, এই জন্য ইহাকে ধনুষ্টঙ্কার কহে। ইহা সদ্যপ্রাণনাশক। দেহ পশ্চাদ্ভাগে নমিত হইলে কাহাকেও বাঁচিতে দেখা যায় না, সম্মুখ দিকে বক্র হইলে দুই একজন বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। পীড়া উপস্থিত হইলে বাতশ্লেষ্মার অত্যন্ত প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পীড়ায় ঘর্ম্মোদ্গম আরম্ভ হইলে রোগীর মৃত্যু ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ইহা স্থির জানিবে। পণ্ডিতগণ যে যে কারণে এই পীড়ার উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই প্রকাশ করিতেছি।

১। মর্ম্মস্থানে আঘাত লাগিলে এই পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। বালকদিগের অন্যান্য মর্ম্মে আঘাত লাগা সম্ভবপর নহে। কেবল নাড়ীকাটাজন্যই তাহাদের নাভিমর্ম্ম নিপীড়িত হইয়া থাকে। তাহাতেই এই সাংঘাতিক পীড়ার উৎপত্তি হয়। ইহার বিশেষ বিবরণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

২। অতিরিক্ত শীতসেবার পর অধিক তাপ সংযোগ অথবা অতিশয় রুক্ষ ক্রিয়ার পর অধিক শীত সেবন দ্বারাও পীড়ার উৎপত্তি হয়। ইহা প্রসূতি বা ধাত্রীর দোষ।

৩। প্রসূতি বা ধাত্রীর অন্যায় ব্যবহার দ্বারা গ্রহকুপিত

হইলেও বালকদিগের ধনুষ্টঙ্কার হইতে পারে। প্রথমোক্ত কারণে কেবল সদ্যোজাত সন্তানেরই এই পীড়া উপস্থিত হয়। ইহাতেই মেয়ে লোকেরা কহিয়া থাকে যে "বালককে পেঁচায় পাইয়াছে।" এতদ্ভিন্ন অপর দুইটী কারণ হইতে পীড়া উপস্থিত হইলে বয়োপ্রাপ্তাবস্থাতেও হইতে পারে। সদ্যোজাত সন্তানের এই পীড়া হইলে প্রায়ই সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ হইতে পারে না। যে কোমল মাংসপিণ্ডে সামান্য অঙ্গুলীর আঘাতও সহ্য হয় না, তাহা কেমন করিয়া এত যন্ত্রণা সহ্য করিবে? সুতরাং দুই একটী লক্ষণ প্রকাশ হইতে না হইতেই অমনি প্রাণবায়ু নিঃশেষ হইয়া যায়। তবে ভাগ্যক্রমে দুই একজন কদাচিৎ বাঁচিয়া থাকে।

চিকিৎসা।—এই পীড়ায় বিরেচক ঔষধ দ্বারা অনেক সময় আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়। দুগ্ধের সহিত হরীতকীচূর্ণ বা এরণ্ড তৈল সেবন করাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। এতদ্ভিন্ন বিরেচন জন্য কোন তীক্ষ্ণ ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। ঔষধ সেবনে অসমর্থ হইলে একটী পানের বোঁটায় করিয়া ঘৃষ্ট বকুল ফল বালকের গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। পৃষ্ঠবংশে শীতল জল সেচন অথবা ধুতূরার পত্র ও বীজ একত্রে শীতল জলদ্বারা পেষণ করিয়া সেই স্থানে প্রলেপ দিলে অনেক উপকার হয়। ধনুষ্টঙ্কার রোগে, মহামাষ

তৈল মর্দ্দন করা নিতান্ত উপযোগী। গাঁজা ও অহি-ফেণের ধূম সর্ব্বদা গায়ে লাগাইলে পীড়ার নিবৃত্তি হইতে পারে। পরিষ্কৃত সুরা বা ধুতূরামূলের রস অতি অল্প পরিমাণে মধ্যে মধ্যে সেবন করাইলে শীঘ্র উপকার হইতে দেখা যায। শোধিত ভাঙ্গ এই পীড়ার একটী মহৌষধ। বালকের বয়োক্রমানুসারে দুই হইতে তিন রতি পর্য্যন্ত এক একবার কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও চিনির সহিত সেবন করিতে দেওয়া যায়। পান করিতে না পারিলে দুগ্ধ ও চিনির ব্যবস্থা, নতুবা কেবল জলের সহিত সেবন করিতে দেওয়াই ভাল। অতি অল্প পরিমাণ দুগ্ধ বা জলের মধ্যে ২।৩ ফোটা করিয়া উগ্রারিষ্ট (গাঁজার অরিষ্ট) সেবন করাইলে বিলক্ষণ উপকার হইয়া থাকে। এই সকল কার্য্যদ্বারা বালকের জীবন রক্ষা পাইলে কয়েক দিন পর্য্যন্ত তাহাকে খুব সাবধানে রাখা কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন গ্রহশান্তির জন্য শাস্ত্রানুযায়ী বিধিমতে গ্রহযাগ করাও একান্ত উচিত। এক্ষণে উগ্রারিষ্টসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কহিতেছি।

উগ্রারিষ্ট।—গাঁজাকে সংস্কৃতভাষায় উগ্রা কহে। তাই এতদ্দারা প্রস্তুতীকৃত তরল পানীয়কে উগ্রারিষ্ট কহা যায়। এই অরিষ্ট প্রস্তুত করিবার বিষয় কামাখ্যা তন্ত্রে যে প্রকার বর্ণিত আছে, তাহাই সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। কীটবীজাদিরহিত উৎকৃষ্ট গাঁজার পত্র

চূর্ণ করিয়া ৩০ তোলা পরিমাণে ওজন করিয়া লইবে। পরে ২০০ তোলা পরিষ্কৃত সুরার সহিত তাহা ভিজাইয়া রাখিবে। সপ্তাহান্তে বারুণী-যন্ত্রে সুরা চুয়াইয়া গাঢ় করিয়া লইবে। ইহাকে গাঁজার সার কহে। এই গাঁজার সার ১ পল, পরিষ্কৃত সুরা ২০ পল, গুড় ৬৬ তোলা, মধু ৩৩ তোলা, একত্রে রুদ্ধভাণ্ডে কিছুদিন রাখিয়া দিবে। ইহাই ছাকিয়া লইলে তাহাকে উগ্রারিষ্ট কহে। ইহা অত্যন্ত মাদক, আক্ষেপনিবারক এবং কামোদ্দীপক। ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগে শরীরের যে অপরিসীম যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া থাকে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ইহা সেবন করিলে তাহা শীঘ্র নিবারিত হয়। পূর্ব্বকালে লম্পটগণ এই ঔষধ মাত্রাবিশেষে সেবন করিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেন।

শৈশব-সংন্যাস।

শরীরে অধিক পরিমাণে দুষ্টরস সঞ্চিত হইলে বাত-পিত্তাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া বালকদিগের বাক্য, দেহ ও মনের ক্রিয়া সকলকে নষ্ট করিয়া মূর্চ্ছা উৎপাদন করে। পীড়া উপস্থিত হইলে বালক কাষ্ঠবৎ নিষ্ক্রিয় ও মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র চেতনা লাভ হয়, তদ্রূপ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিলে বালকের জীবনান্ত হইবার সম্ভাবনা।

চিকিৎসা।—মূর্চ্ছিতাবস্থায উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বাবা কপালে ঈষৎ দাহ করিলে অথবা নখাভ্যন্তরে সূচীবিদ্ধ করিয়া পীড়ন কবিলে উপকার হইতে পারে। তাহাতে অনিষ্ট হইবাব কোনও আশঙ্কা নাই। মুখমণ্ডলে শীতল জলেব ছিটা ও মস্তকে শীতল জল সেচন কবিলেও মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়। এই সকল কার্য্যদ্বাবা মূর্চ্ছাভঙ্গ না হইলে পাড়া কখনও সহজ মনে কবিবে না। নিশাদল ও কলিচূণ একত্রে মর্দ্দন কবিযা শিশুব নাসিকাব মধ্যে সংলগ্ন কবিযা রাখিলে সেই আঘ্রাণেও মূর্চ্ছা অপনীত হইতে পাবে। হস্তপদে উষ্ণজল সেক কবিযা উপব হইতে নিম্নদিকে চুঁচিযা লইলে অনেক উপকাব হয। রাইসর্ষপ ও শুঁঠ একত্রে পেষণ কবিযা উষ্ণজলে গুলিয়া লইবে। তাহাই বস্ত্রখণ্ডে লিপ্ত কবিয়া গ্রীবাদেশে কিছুকাল বসাইযা বাখিবে এবং হস্তপদে অগ্নিব তাপ দিবে। তাম্রভস্ম, বেণাবমূল এবং নাগেশ্বব অর্দ্ধবতি কবিযা একত্রে শীতল জলেব সহিত সেবন করাইলে শীঘ্র মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয। মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে রসচূর্ণ, এবণ্ডতৈল অথবা অন্য কোন মৃদুবিরেচক ঔষধ প্রয়োগ কবিয়া শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কাব কবিবে। মধুব সহিত বিড়ঙ্গচূর্ণ সেবন করাইলে উপকাব ভিন্ন অপকাবেব সম্ভাবনা নাই। বচচূর্ণ ও মধুব সহিত কিঞ্চিৎ রসসিন্দুব সেবন করাইলে অতি আশ্চর্য্যরূপে পীড়ার উপশম হইতে দেখা যায়। পীড়িতাবস্থায় শিশুকে

অশুদ্ধ স্তন্যপান কবিতে দেওয়া উচিত নহে। তাহাতে পীড়ার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শিশুকে স্তন্যপান করাইতে হইলে প্রথমে স্তন্য-দায়িনীর স্তনদুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। মূর্চ্ছিতাবস্থায় কাহাবও কাহাবও ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ প্রকাশ পাইযা থাকে। তাহাহইলে শিশুকে শীঘ্র বিরেচক ঔষধ সেবন করাইবে। যদি শিশু ঔষধ সেবন করিতে না পারে, তাহাহইলে কোন তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ তাহার জিহ্বায মাখাইয়া দিবে। অথবা গুহ্যদ্বারে পীচ কারী দিয়া ঔষধ ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবে। আব তাহাব উদবে এবণ্ডতৈল মর্দ্দন করিবে। এই সকল কায্যদ্বারা বিবেচন হইলে পীড়ার হ্রাস হইয়া থাকে। পরিশেযে রোগীকে গরম জলে স্নান করাইয়া সমস্ত শরীরে কুব্জপ্রসারিণীতৈল বা মাষতৈল মর্দ্দন করিতে দিবে।

অন্নপ্রাশন বিধি।

শিশু ষষ্ঠমাসে পদার্পণ করিলেই তাহার অন্নপ্রাশ-নের কাল উপস্থিত হয়। ইহাব পূর্ব্বে অন্নপ্রাশন দেওয়া উচিত নহে। কেননা ষষ্ঠমাসেব পূর্ব্বে বালকেবা কঠিন বস্তু চর্ব্বণ করিতে পারে না, সুতবাং তাহা পরি-পাকও হয় না। সেই সময় তরল বস্তুই তাহাদিগের

পক্ষে একমাত্র উপযোগী। অধিকন্তু স্তনদুগ্ধ এবং গব্যদুগ্ধে পুষ্টিকারক পদার্থ অধিক পরিমাণে আছে বলিয়া তাহাতে শীঘ্র শীঘ্র বালকের শরীর পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু দন্তোদ্‌গমের কাল উপস্থিত হইলে যখন বালক একটু একটু করিয়া চর্ব্বণ করিতে পারে, তখনই তাহার অন্নারম্ভ হওয়া উচিত। নতুবা দন্তোদ্ভেদিক পীড়া হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা। দন্তোদ্‌গমের কাল উপস্থিত হইলেও যাহাদের অন্নারম্ভ না হয়, তাহাদের নিশ্চয় ঐ পীড়া হইয়া থাকে। ঐ পীড়ার কথা পরে বিশেষ করিয়া কহিব। আবার সপ্তম মাস এবং নবম মাসেও অন্নপ্রাশন দেওয়ার নিয়ম আছে। কিন্তু নবম মাস অতীত হইলে আর অন্নপ্রাশন দেওয়ার রীতি নাই। তখন উহা না দিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে যে পর্য্যন্ত অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া বা অন্য কোন প্রকারে মনোগতভাব প্রকাশ করিতে না পারে, যে পর্য্যন্ত তাহাকে অন্যের তত্ত্বাবধানেই থাকিতে হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার পদে পদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। নানাপ্রকার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলেও যখন বালক ৬।৭ মাস বা ৯ মাস কাল নিরাপদে অতিবাহিত করে, তখন হিন্দুমাত্রেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার এবং সন্তানের ভাবী মঙ্গলের জন্য আত্মারূপী পরমাত্মীয়, দেবদেবীগণের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এইজন্যই

হিন্দুগণ সন্তানাদির অন্নপ্রাশনকে একটী মঙ্গলজনক আনন্দের ব্যাপার বলিয়া মনে করেন। আবার এই উপলক্ষে হিন্দুগণ পূর্ব্বপুরুষদিগের তৃপ্তির জন্য তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধাদিও করিয়া থাকেন। ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। আত্মা অবিনাশী, কিছুতেই তাহার ধ্বংস নাই। কেবল কর্ম্মজন্য মধ্যে মধ্যে শরীরান্তর পরিগ্রহ করিয়া থাকে। "যে পিতৃপুরুষগণের অনুগ্রহে সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া নিরাপদে অপত্যমুখ দর্শন করা যায়, সেই পিতৃপুরুষগণের আত্মামৃত্যুর পর যে স্থানে যে ভাবেই অবস্থিতি করুন না কেন, সেই স্থানে সেই ভাবে থাকিয়াই সন্তানের মঙ্গল বিধান করিবেন, এইটী মনে করিয়াই হিন্দুগণ অন্নপ্রাশনের সময় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। ইহা না করিলেই বরং সন্তানের অমঙ্গল হইতে পারে।

দন্তোদ্ভেদিক পীড়া।

দাঁত উঠিবার সময় বালকগণ জ্বর, উদরাময়, কাসি, বমি, আক্ষেপক, শিরোবেদনা ও নেত্ররোগ প্রভৃতি পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকে। কেনই বা এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইয়া সহসা শিশুদিগকে যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে, তাহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা বড়

সহজ নহে। তবে মোটামোটি এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট যে মাংস-রাশি ভেদ করিয়া দন্ত বাহির হইবার সময় প্রথমতঃ সেই স্থানে বেদনা হয় বা উক্ত স্থান অবিরত চুলকাইতে থাকে। সেই সময় আবার বালকের অঙ্গসঞ্চালন করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, সুতরাং শিশু হামাগুড়ি দিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানেও যাইতে পারে। চুলকানি নিবারণের জন্য হাতের কাছে যাহা পাওয়া যায়, বালক তাহাই মুখের মধ্যে দিয়া অবিরত চিবাইতে থাকে। এইরূপে কটু কষায়ণ কত বস্তুই যে শিশুর উদরস্থ হয়, তাহা সন্তান-রক্ষয়িত্রী ভিন্ন আর কেহই সম্যক জানিতে পারে না। এইজন্যই প্রথমতঃ উদরাময় হইয়া পরে অন্যান্য উপদ্রব সমূহ উপস্থিত হইয়া থাকে। দন্তোদ্ভেদিক পীড়ায় বিশেষ কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। দন্ত উদ্গত হইলে আপনা হইতেই উহা উপশমিত হইয়া থাকে। অথবা একটা ধান দ্বারা দন্তনালী ছিঁড়িয়া দন্তোদ্ভেদের সহায়তা করিয়া দিলেও উপকার হইয়া থাকে। যাঁহারা ধান দ্বারা দন্তনালী ছিঁড়িয়া দিতে বা শস্ত্র প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত, তাঁহাদের পক্ষে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রয়োগ করাই ভাল।

ধাইফুল ও পিপুলচূর্ণ একত্রে মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া দন্তনালী ঘর্ষণ করিলে অথবা কেবল আমলকীর

রস ঘর্ষণেও শীঘ্র শীঘ্র দন্তোদ্গত হইয়া থাকে। যদি আপনা হইতে পীড়ার উপশম না হয়, এবং অনবধানতা-বশতঃ প্রতীকারেরও কোন উপায় চেষ্টা করা না যায়, অথচ ক্রমেই বালক নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ হইয়া একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন দন্তোদ্ভেদগদান্তক বটী, কুমারকল্যাণ ঘৃত এবং পিপ্পল্যাদি ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করা উচিত।

দন্তোদ্ভেদগদান্তক বটী।—ইহার একটী করিয়া বটী জলে ঘষিয়া দন্তস্থানে লাগাইয়া দিলে শীঘ্র দন্তো-দ্গত হয়। দিনের মধ্যে ৩।৪ বার দেওয়া আবশ্যক। জ্বর, আক্ষেপ, অতিসার প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক উপদ্রব সমূহ নিবারণের জন্য এক বেলা বা প্রয়োজন হইলে দুই বেলা মধু অথবা স্তন-দুগ্ধের সহিত এক একটী বটী সেবন করিতে দিবে। এইরূপে ৩।৪ দিনের মধ্যেই সমুদায় পীড়া উপশমিত হয়। এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, বনযমানী, যমানী, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, নগেশ্বর, মুথা, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিটলবণ, এই ১৮ খানি দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সমানভাগে খলের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে এবং অভ্র, শঙ্খভস্ম, লৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই দ্রব্যচতুষ্টয়ও পূর্ব্বোক্তভাগে উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে।

পরে জল দ্বারা উত্তমরূপে মাড়িয়া ২ রতি পরিমাণ এক একটী বটী বাঁধিয়া সাবধানে রাখিতে দিবে।

কুমারকল্যাণ ঘৃত।—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ দ্রাক্ষা, চিনি, শুঁঠ, জীবন্তী, জীবক, বেড়েলা, শটী, দুরালভা, বেলশুঁঠ, দাড়িম ফলের ছাল, তুলসী, শালপাণি, মুথা, কুড়, ছোটএলাইচ, গজপিপ্পলী প্রত্যেকে ২ তোলা। ক্বাথার্থ কণ্টকারী /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের এবং গব্যদুগ্ধ ।৬ সের। যথাবিধি পাক সমাধা করিয়া সকাল বেলা সেবন ব্যবস্থা করিবে। ইহাদ্বারা দন্তস্তেদ-জনিত পীড়া ও অন্যান্য বহুবিধ পীড়া উপশমিত হয়। আরও এতদ্দ্বারা বালকদিগের দেহপুষ্টি ও বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পিপ্পল্যাদি ঘৃত।—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ পিপুল, ধাইফুল, আমলা, কেশুর, বচ, মূর্ব্বামূল, গুলঞ্চ, আকান্দি, কট্‌কী, আতইচ, মুথা, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, কাকলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক সমাধা করিয়া ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন ব্যবস্থা করিবে। অন্নারম্ভের পূর্ব্বে অর্দ্ধ আনা হইতে এক আনা মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। ঊর্দ্ধ বয়সে ৶০ আনা মাত্রায়ও সেবন করা যাইতে পারে। দন্তোদ্‌গমের উপক্রম হইলে যদি এই ঔষধ সেবন করান যায়, তাহা হইলে আর

দন্তোদ্‌গমকালীন পীড়াসমূহের উৎপত্তি হয় না এবং পীড়া উৎপন্ন হইলেও এতদ্দারা তাহা উপশমিত হইয়া থাকে।

পারিগর্ভিক।

একটী সন্তান স্তন্য পরিত্যাগ না করিতেই যদি জননী পুনর্ব্বার গর্ভবতী হয়, তবে সেই স্তন্য পান করিয়া সন্তান ক্রমে ক্রমে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, কাস, বমি, তন্দ্রা ও উদরস্থূলতা প্রভৃতি উপদ্রব দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বলেন, স্তনদুগ্ধের অপ্রাপ্তি হইলেও ঐ সকল পীড়া উপস্থিত হইতে পারে। এই পীড়াকে পারিগর্ভিক কহে। কিন্তু মেয়েলোকেরা সাধারণতঃ ইহাকে এঁড়ে লাগা কহিয়া থাকে।

চিকিৎসা।—এই পীড়ায় যতপ্রকার উপদ্রবই হউক না কেন, তৎসমুদায়ের চিকিৎসা করিতে হইলে পরিপাকশক্তির উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে গর্ভবতী জননীর স্তনদুগ্ধ পান করিতে না দেওয়া ভাল। অগ্নিমান্দ্যাধিকারোক্ত বিধানানুসারে ইহা চিকিৎসা করা বিধেয়। নিম্নে কয়েকটী ঔষধের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে।

কুমারকল্যাণ রস।—যে পরিমাণ ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার একটা ভাগ স্থির করিয়া প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ রসসিন্দুর ওজন করিয়া লইবে। রসসিন্দুর খানি উত্তমরূপে চূর্ণ কবিয়া তাহার সহিত যথারীতি শোধিত ও মারিত মুক্তা, স্বর্ণ, অভ্র, লৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক মিশ্রিত করিয়া লইবে। মুক্তাদি দ্রব্যগুলির প্রত্যেকটীই রসসিন্দুরের সমান হওয়া আবশ্যক। পরে উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃতকুমারীর রসের সহিত উত্তমরূপে মাড়িয়া মুগের ন্যায় এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে। বালকের বয়স ও রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া এক বা অর্দ্ধবটী করিয়া এক একবার প্রয়োগ করিবে। অনুপান দুগ্ধ ও চিনি। ইহা সেবন করাইলে শিশুর জ্বর, শ্বাস, বমন, কামলা, অতীসার, কৃশতা ও অগ্নিবিকৃতি প্রভৃতি পারিগর্ভিক সমুদায় উপদ্রব দূরীভূত হয়।

অরবিন্দাসব।—পদ্ম, বেণারমূল, গাম্ভারীফল. নীলোৎপল, মঞ্জিষ্ঠা, বেড়েলা, জটামাংসী, মুথা, অনন্ত-মূল, হরীতকী, বহেড়া, বচ, আমলা, শটী, শ্যামালতা, নীলমূল, পটোলপত্র, ক্ষেতপাঁপড়া, অর্জ্জুনছাল, মৌলফল যষ্টিমধু, মুরামাংসী প্রত্যেক ১ পল, দ্রাক্ষা ২০ পল, ধাইফুল ১৬ পল। এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। চূর্ণগুলি কাপড়ে ছাকিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। প্রথমতঃ এই সকল দ্রব্য কোন

মৃৎপাত্রে নিক্ষেপ করিয়া তন্মধ্যে চিনি ১২॥০ সের, মধু ৬৷০ সের এবং জল ১২৮ সের প্রদান করিবে। পরিশেষে পাত্রটী বেশ করিয়া ঢাকিয়া দিয়া এক মাস কাল সেইরূপ অবস্থায় রাখিয়া দিবে। মাসান্তে কল্কগুলি ছাকিয়া ফেলিলেই আসব প্রস্তুত হইবে। এই ঔষধ সেবন করিতে কিছুমাত্র কষ্ট নাই। ইহা বালকদিগের পক্ষে নিতান্ত উপযোগী। এক বৎসরের শিশুর পক্ষে অৰ্দ্ধ ছটাক, দুই বৎসরের বালকের পক্ষে এক ছটাক মাত্রায় দিনের মধ্যে ২।৩ বার করিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহাতে এঁড়ে লাগা ও গ্রহদোষ প্রভৃতি দূরীভূত হয়। পরন্তু এতদ্দ্বারা বালকের বল, পুষ্টি, অগ্নি ও আয়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শিবামোদক।—হরীতকী, ভূঁই আমলা, মূর্ব্বামূল, শুলফা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আলকুশিবীজ, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, লবঙ্গ, শতমূলী, মুরামাংসী, মৌরী, জটামাংসী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শুঁঠ, অনন্তমূল, আমলা, শ্যামালতা, বামুনহাটী, গজপিপুল, পিপুল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, মেথী, হালিম, কালীজীরা, যমানী, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, তালমূলী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুরবীজ, প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান দ্রাক্ষা এবং দ্রাক্ষার সমান চিনি। যথারীতি পাক সমাধা করিয়া শীতল হইলে উপযুক্ত পরিমাণে মধু মিশাইয়া লইবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে দুগ্ধের

সহিত এক মাষা মাত্রায় সেবনীয়। ইহা বালকদিগের সর্ব্বরোগনাশক, ও পুষ্টিকর, বলকারক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক, মেধাজনক, আয়ুষ্য ও গ্রহদোষনিবারক।

পরিশিষ্টাধ্যায়।

লোকমুখে শুনিতে পাই, বাল্য-বিবাহই, নাকি সকল প্রকার অনর্থের মূল। তাহাতেই নাকি ভারতের অধঃ-পতন হইতেছে। তজ্জন্যই নাকি ভারতবাসী দিন দিন দুর্ব্বল ও ক্ষীণ-মস্তিষ্ক হইতেছেন। অল্পায়ু হইবারও নাকি তাহাই একমাত্র কারণ। কিন্তু এই সকল কথা কোন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য পণ্ডিতের মুখে বা বৈদেশিক মতাবলম্বী দেশীয় ডাক্তারের মুখে শুনিতে পাই না। বোধ হয়, শারীর-বিজ্ঞানে তাঁহাদের কথঞ্চিৎ অধিকার আছে বলিয়াই তাঁহারা কখনও এইরূপ কথা বলেন না। এম্, এ, বি, এ. উপাধিধারী কতিপয় বাবুই কেবল এই আন্দোলনে সর্ব্বদা বিব্রত থাকেন। বর্ত্তমান এম্, এ, ও বি, এ, ক্লাসে কতদূর পর্য্যন্ত শারীরতত্ত্বের পর্য্যালোচনা হয়, তাহা বলিতে পারি না, অথবা বিদ্যা-লয় পরিত্যাগ করিয়াই যে বাবুগণ কতদূর পর্য্যন্ত দেহ-তত্ত্বের সমালোচনা করেন, তাহাও কিছুমাত্র অবগত নহি। শারীর-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করাই যাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, শরীর-তত্ত্বে বিজ্ঞতা লাভ করিতে না পারিলে যাঁহাদের কিছুই নির্ব্বাহ হয় না, তাঁহারাই যখন এবিষয় দ্বিরুক্তি করেন না, তখন সংসারতত্ত্বানভিজ্ঞ বিদ্যালয়ের

ছাত্রদিগের পক্ষে কি ইহা অনধিকারচর্চ্চা নয়? তবে পরদুঃখকাতরতা জন্য, পরের দুঃখ—দেশের দুরবস্থা বিমোচনের জন্য, দেশময় সকলকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্যই যদি তাঁহারা এরূপ করেন বলা যায়, তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভবে? যাঁহারা আত্মীয় স্বজনের দুঃখে কাতর নহেন, পিতামাতার দুঃখ-মোচন—তাহাদের সহিত একত্রে বাস করিতে যাঁহারা সম্পূর্ণ অক্ষম, তাঁহারা আবার কেমন করিয়া জগতের দুঃখ-মোচন করিবেন? জগতের সহিত একতাবদ্ধ হইবেন? একথা যিনি বিশ্বাস করেন, তাঁহাকেও পাগল ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। আজ কাল আবার একদল ফটিকচাঁদ বাবু হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অসাধারণ বিদ্যা, বুদ্ধি ও কার্য্যকারিতার কথা শুনিলে একবারে কানে হাত দিতে হয়। বাবুদিগের বসতবাটীতে ঘর থাকুক, আর নাই থাকুক, পিতামাতা প্রভৃতি পরিবারবর্গ ভিক্ষা বা উপবাসের সাহায্যে যে প্রকারেই কালক্ষেপ করুন না কেন, তৎপ্রতি তাঁহাদের কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই, কিন্তু নিজের গ্রাসাচ্ছাদনটা খুব ভাল হওয়া চাই। আর পরের ঘরে বিধবা বালিকা বা যুবতী দেখিলে অমনি "ব্রহ্মা কৃপাহি কেবলম্" বলিয়া দর দর ধারায় অবিরত অশ্রুপাত কবিতে থাকেন। কবে ব্রহ্মের কৃপা হইবে, কতদিনে দেশের দুরবস্থা ঘুচিবে ইত্যাদি বলিয়া অক-

শেযে বাল্য-বিবাহই যে সকল দোষের মূল, ইহাই স্থির করিয়া সেই পতি-বিয়োগ-বিধুরা সরলা কুলবালাকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই সকল বাবুদিগের মধ্যে অনেকেই যে ইংরাজীভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শী, তাহা নয়। প্রবেশিকা পর্য্যন্তও কেহ অধ্যয়ন করিয়াছেন কি না সন্দেহ। কেহ কেহবা বঙ্গবিদ্যালয়েও প্রবেশ করেন নাই। তাঁহারাই আবার লম্বা লম্বা বক্তৃতাদ্বারা আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া তুলেন। কিন্তু বক্তৃতাগুলি প্রায়ই বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে হইয়া থাকে। কোথায় কোন্ অন্তঃপুরে কোন্ বালিকা মনমত বর না পাইয়া চারিদিক্ শূন্য দেখিতেছে, কোথায় কোন্ যুবতী বৈধব্যযন্ত্রণায় অবিরত ছট্ ফট্ করিতেছে—একাদশীর করালগ্রাসে হিরণ্ময় দেহ অঙ্গারময় করিতেছে, কে কোথায় কতটী ভ্রূণ-হত্যা করিয়া দিন দিন পাপ-পঙ্কে লিপ্ত হইতেছে, দিবানিশি এই ভাবনাতেই বাবুরা কেবল ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন। এদিকে যে নিজের অন্তঃপুরে নিত্য নূতন কত প্রকার অত্যদ্ভুত কাণ্ডকারখানা হইয়া যাইতেছে, নিজের পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, জীর্ণদেহে ক্ষীণস্বরে অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেন, তৎপ্রতি বাবুদিগের কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত নাই। ভাল, নবাশিক্ষিত ফটিকচাঁদ বাবুগণ! এস্থলে আপনাদিগকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, জগতে

সকলেই যদি স্বার্থত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র পরার্থের জন্যই ব্যস্ত হয়, পরের ইষ্টচিন্তাই যদি সকলের একমাত্র জীবনের সার হয়, তবে সেই অর্থ—সেই ইষ্টলাভ করিবার লোক কোথায় পাওয়া যাইবে? জগদম্বার রাজ্যে তদ্রূপ কোন প্রাণীত এপর্য্যন্তও সৃষ্টি হয় নাই! নিরাপদে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে সকলেই যদি পরস্পর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখে, তবেই জগতের মহান্ উপকার সাধিত হইতে পারে। আর সংসার-ত্যাগীর পক্ষে স্বতন্ত্র কথা। সংসারে সকলেই কর্ম্মফল ভোগ করে। কর্ম্মাবসান না হইলে কাহারও নিস্তার নাই। আপনারা চেষ্টা করিয়া কাহাকে সুখে রাখিবেন? আপনারা যাহাকে সুখ মনে করেন, হয়ত অন্যের পক্ষে তাহা প্রকৃত সুখ নাও হইতে পারে। হয়ত তাহাই তাহার অধঃপতনের সোপান। তবে কেন সেই সোপান উদ্ঘাটন করিয়া দেন? এই যে কোন্ যুবতী কোথায় কতটী উপপতি করিল—কোন্ অন্তঃপুরে কে কতটা ভ্রূণ-হত্যা করিল, ইত্যাদি বলিয়া বাল্যবিবাহকেই সকল দোষের নিদান মনে করিতেছেন, এবং সেই ভাবনাতেই দিন দিন একবারে অস্থিচর্ম্মসার হইতেছেন, এদিকে যে আপনাদের দেহান্তঃপুরমধ্যে মনরূপিণী পরমা রূপবতী কামিনী কামক্রোধাদি উপপতির সহিত প্রসক্তি স্থাপন করিয়া নিত্য নূতন কতই ভ্রূণ-হত্যা করিতেছে, আপনার পরম মিত্র

প্রাণাপানাদির সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিতেছে. তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিতে দোষ আছে ? আর স্ত্রীশিক্ষা— বাবুদিগের এই অদ্ভুত স্ত্রীশিক্ষার কথা মনে হইলে অন্তঃকরণ আরও বিষাদে পূর্ণ হয়। শিক্ষা বলিলে কি কেবল লেখা পড়াই বুঝিতে হয় ? লেখা পড়ার সহিত তাহার সংস্রব থাকিতে পারে, কিন্তু দিবারাত্র লেখাপড়া করিলে প্রকৃত শিক্ষার কিছুই হয় না। রীতিমত শিক্ষিতা হইতে হইলে অনেক দেখিতে হয়, অনেক শুনিতে হয়, বহুকাল পর্য্যন্ত সংসারের নিয়মাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। এইরূপ নিয়মে পূর্ব্বতন হিন্দুগণ স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষাদান করিতেন, তাই তাঁহারা লেখাপড়া না শিখিয়াও শিক্ষিতা হইতে পারিতেন। পূর্ব্বকালে সকলের সংসারই সুখের ছিল। পরিবারের মধ্যে কাহারও অন্তরে হিংসাদ্বেষের লেশমাত্র লক্ষিত হইত না। দয়াদাক্ষিণ্য সহিষ্ণুতাগুণে অবলামাত্রেই সমলঙ্কৃতা ছিলেন। তাঁহারা যথানিয়মে সুশৃঙ্খলতার সহিত গৃহকার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতেন, তাই তাঁহারা গৃহলক্ষ্মী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। আজকাল যে প্রকার নিয়মে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাতে অপকার ভিন্ন উপকারের সম্ভাবনা কিছুতেই নাই। এইরূপ শিক্ষায় কেবল অসৎ প্রবৃত্তিরই উত্তেজনা করিয়া দেওয়া হয়। বালিকাকাল হইতে নিয়ত যথেচ্ছা গমনাগমন, যথেচ্ছাভাবে সকলের

সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে করিতে কাহারও চরিত্র-দোষ না হইয়া যায় না। তাহাতে আবার লেখাপড়া শিখাইলে আরও সোনার উপর মিনার কাজ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু প্রভেদের মধ্যে এই যে আমরা যাহাকে অসৎপ্রবৃত্তি বলি, আমরা যাহাকে চরিত্র-দোষ না বলিয়া থাকিতে পারি না, বর্ত্তমান যুবকগণ নব্য সভ্যতার অনুরোধে তাহাকেই কিন্তু সচ্চরিত্রতার আদর্শ বলিয়া মনে করেন। আমাদের পক্ষে যাহা নিতান্ত ঘৃণিত—দুরপনেয় কলঙ্ক, তাহাই তাঁহাদের নিকট মঙ্গল-দায়িনী মহতী কীর্ত্তি। এ দুঃখের কথা বলিবার আর স্থান কোথায়? একবার নিরপেক্ষভাবে চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক বর্ত্তমান হিন্দুমহিলামণ্ডলে দৃষ্টি বিক্ষেপ করিলে সকলেই বিলক্ষণ জানিতে পারেন যে অশিক্ষিতা রমণী-দিগের মধ্যে বা কতদূর পর্য্যন্ত শান্তি ও সতীত্ব বিরাজ করিতেছে এবং শিক্ষিতা মহিলা সমাজেইবা কি পর্য্যন্ত ব্যভিচারদোষ ও বীভৎস কাণ্ড উপস্থিত হইতেছে। কিন্তু নব্য বাবুগণ তাহা প্রাণান্তেও স্বীকার করিবেন না! যাহাহউক, আমার বিবেচনায় যতই দেশমধ্যে বিলাতী-ভাবে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হইবে, ততই ভারতবাসী দিন দিন অল্পায়ু ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়িবেন। দারিদ্র্য-দুঃখ বৃদ্ধিরও ইহাই একমাত্র কারণ। পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোক-গণ নিজ নিজ অন্তঃপুরে লেখাপড়া শিক্ষা করিতেন কি

না, তাহা এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু নীতি বিষয়ে সকলেই অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন। যথা-সময়ে সন্তান-পালন ও গৃহকার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়া পরিবারস্থ দশজনের মন যোগাইয়া চলিতে জগতে হিন্দুমহিলা ভিন্ন আর কোন্ জাতি শিক্ষা করিয়াছিল? তাঁহারা ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বদা কেবল সংসার-চিন্তাতেই লিপ্ত থাকিতেন, তাই তাঁহাদের চিত্তবৃত্তিও কখনও কুপথে অগ্রসর হইতে পারিত না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বালিকাবস্থা হইতেই প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করায় কেহই আর পূর্ব্বের ন্যায় গৃহকার্য্য ও নীতিবিষয়ে সম্যক্ উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। অধিকন্তু আবার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সকলেই কেবল নাটক, উপন্যাস লইয়াই দিবারাত্রি অতিবাহিত করেন। ইহাতে কখনই কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা না হইয়া যায় না। সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাও অধিক কঠিন নহে। লেখা পড়া শিক্ষা করায় সহজেই মনোগত ভাব অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে পারা যায়। এই সকল কারণেই বর্ত্তমান মহিলা-মণ্ডলে ব্যভিচারদোষ দিন দিন প্রবল হইতেছে। কিন্তু কুলাঙ্গার পুরুষগণ আর তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। কেবল অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে দুই এক জনের চরিত্রদোষ আছে, তাহাই সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আবার লেখা পড়ার আলোচনাতেই সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত

থাকিতে হয়, তজ্জন্য কেহই আর পূর্ব্বের ন্যায় সন্তান-পালন ও গৃহকার্য্যাদির প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন না। সুতরাং তৎকার্য্য সম্পাদনের জন্য অতিরিক্ত লোক নিযুক্ত করিতে হয়। যাঁহারা অবস্থাপন্ন—যাঁহাদের বিলক্ষণ সঙ্গতি আছে, তাঁহারা অনায়াসেই সেই সকল ব্যয়ভার বহন করিতে পারেন। মধ্যবিধ লোকেও কোনরূপে দুঃখে কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কিন্তু দরিদ্রের পক্ষে আর কিছুতেই নিস্তার নাই। দরিদ্রের ঘরে শিক্ষিতা স্ত্রী হইলে সেই হত-ভাগ্যের মৃত্যুই কেবল মঙ্গল এবং শান্তিপ্রদ। তবে শিক্ষার দোষেই যে ভারতবাসী দিন দিন হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা না বলিব কেন? আবার পক্ষান্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে আরও জানা যাইবে যে শিক্ষার জন্যই হিন্দুগণ দিন দিন অল্পায়ু ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছেন। একদিকে অবরোধপ্রথার শিথিলতা, অন্য দিকে বিলাতী মতে স্ত্রীশিক্ষার আতিশয্য, ইত্যাদি কারণে কোন স্ত্রীলোকেরই চিত্তবৃত্তি সকল সময় সৎপথে বিচরণ করিতে পারে না। অস্থিরপ্রকৃতি রমণীর গর্ভেও কখনও সুস্থ বা দীর্ঘায়ু সন্তান জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদীয় সুশ্রুত সংহিতার শারীরস্থানে এই সকল বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। সুতরাং তৎ-সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। এই-

ক্ষণ হিন্দুদিগের বিবাহ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথার অবতারণা করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করা যাইতেছে।

নিজ পরিবারস্থ বা নিজবংশীয় কোন পুরুষের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন করা হিন্দুসমাজে প্রচলিত নাই। কেন নাই—সেই সকল হিন্দুবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম তত্ত্ব পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী পণ্ডিতমণ্ডলীর সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে পরিস্ফুট হইবে কিনা, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। তবে আমি এইমাত্র বলিতেছি যে তদ্রূপ বিবাহ হিন্দু-দিগের সমাজ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ। হিন্দুমাত্রেই বিলক্ষণ অবগত আছেন যে কন্যা হইলেই তাহাকে পরানুগ্রহে পর-গৃহে চিরকাল অতিবাহিত করিতে হইবে। সুতরাং সেই পরের সহিতই যাহাতে আত্মীয়তা বৃদ্ধি হয়, সেই পরই যাহাতে আপন হইয়া দাঁড়ায়, পরের প্রণয়ই যাহাতে দিন দিন বদ্ধমূল হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা হিন্দু-মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। এই জন্যই আর্য্যগণ স্বীয় দুহিতাকে কন্যকাবস্থাতেই পতি-হস্তে সমর্পণ করিয়া থাকেন। ইহাতে কোন পরিবারেরই উন্নতি ব্যতীত অবনতি হইতে পারে না। পাশবরৃত্তি-চরিতার্থ করা বাল্য-বিবাহের উদ্দেশ্য নহে। যাহারা পশু—যাহারা কাণ্ড-জ্ঞান-বর্জ্জিত নরাধম, তাহারাই তদ্রূপ মনে করিতে পারে। যে সকল সমাজে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত নাই,

সেই সকল সমাজেই নানাপ্রকার বীভৎসকাণ্ড সর্ব্বদা উপস্থিত হইয়া থাকে। তবে সভ্যতাবরণে চক্ষু আবৃত থাকায় তাহা কাহারও নয়ন-পথে পতিত হয় না। এই অভিনব সভ্যতায় শীঘ্রই যে হিন্দুনাম বিলুপ্ত হইবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই বলিয়া থাকেন যে বাল্য-বিবাহের জন্যই হিন্দুবিধবার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ভাল, তাহাই যদি হয়, তবে যে সমাজে যুবতীবিবাহ প্রচলিত আছে, সে সমাজে কি কেহ বিধবা হয় না? কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে পুনর্বিবাহ প্রচলিত থাকায় অধিক দিন আর কাহাকেও বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। সেই সকল সমাজ অপেক্ষা হিন্দুদিগের যে পারিবারিক উন্নতি, পারিবারিক সুখ অত্যন্ত অধিক, তাহা কি কেহই বিশ্বাস কবিবেন না? ভাল কবিয়া না বুঝিয়া সেই সুখের পথে কণ্টক রোপণ করা কি বুদ্ধিমান্ লোকের কর্ত্তব্য? কোন নূতন নিয়ম সমাজ-মধ্যে প্রচলিত করিতে হইলে প্রথমে তাহার উপকারিতা ও অপকারিতার বিষয় সুন্দর রূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে হয়। পরিশেষে উপকারিতার ভাগ অধিক বলিয়া প্রমাণিত হইলে তাহাই রাজানুশাসনের কঠোর নিয়মে জনসমাজে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নতুবা অদ্য এক নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া আবার দশ বৎসর পর অন্য নিয়ম

সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিলে সমাজমধ্যে ক্রমেই ঘোর বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইতে থাকে।

সৃষ্টির অব্যবহিত পর যখন সমগ্র পৃথিবী ঘোর অসভ্যতাবরণে আবৃত ছিল, সেই সময় বিবাহ সম্বন্ধে কোন দেশেই কোন একটা স্থিরতর নিয়ম ছিল না। যে যাহাকে ইচ্ছা করিত, সে তাহাকে লইয়াই আনন্দে বিহার করিত। সেইরূপে বহুসহস্র বৎসর অতীত হইলে যখন তাহার বিষময় ফলে ক্রমশঃ বিষ উদ্গীরণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন রাজ্যেশ্বর কর্ত্তৃক সেই নিয়ম রহিত হইয়া বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইল। তদনন্তর আর কেহ বিবাহ না করিয়া কাহারও সহিত বিহার করিতে পারিত না। কিন্তু যখন কার্য্যানুসারে দেশমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের সংগঠন হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে আচার, বিচার, কর্ম্মাকর্ম্ম ও গ্রাসাচ্ছাদনের সম্পূর্ণ বৈষম্যভাব উপস্থিত হইল, তখন আবার জন-সমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা লক্ষিত হইতে লাগিল। অর্থাৎ মসীজীবি কৃষিজীবির কন্যাকে পাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। কৃষিজীবির আবার মসীজীবির কন্যার সহিত পরিণয় হওয়ায় দিন দিন তাহাদের সংসারের অবনতি হইতে লাগিল। ইত্যাদি কারণে "এক সমাজের পুরুষ অন্য সমাজের কন্যার সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবে না" ইহাই রাজার ব্যবস্থারূপে পরিণত হইল।

এস্থলে আর্য্যদার্শনিকগণ আরও সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহারা কহিতেন, উৎকৃষ্ট বীজ নিকৃষ্ট ক্ষেত্রে রোপিত হইলে যদিও বীজগুণে অঙ্কুরিত হয়, তথাপি ক্ষেত্রদোষে তজ্জাত বৃক্ষ কখনও পরিপুষ্ট হইতে পারে না। আবার নিকৃষ্ট বীজ উৎকৃষ্টক্ষেত্রে রোপিত হইলেও সেই ভাব প্রাপ্ত হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞান-চর্চ্চায় ব্রাহ্মণগণই চতুর্ব্বর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং সংসারাশ্রমী ব্রাহ্মণগণ ইচ্ছা করিলে চতুর্ব্বর্গের কন্যাকেই বিবাহ করিতে পারিতেন; ক্ষত্রিয়গণ অবশিষ্ট বর্ণত্রয়ের কন্যাকে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; বৈশ্যগণ বৈশ্য ও শূদ্রকন্যাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিতেন। শূদ্র কেবল শূদ্রকন্যাকেই বিবাহ করিতেন। কিন্তু ইহার মধ্যেও যখন নানাপ্রকার দোষ লক্ষিত হইতে লাগিল অর্থাৎ নিকৃষ্ট সমাজের কন্যা সহসা উৎকৃষ্ট সমাজের লোকের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় যখন কিছুতেই তাহাদের চিত্তবৈষম্য বিদূরিত হইতে পারিল না, সুতরাং ক্রমেই সংসারের অবনতি ও সন্তান-সন্ততিগণ ক্রমেই ক্ষীণমস্তিষ্ক হইতে লাগিল, তখন আবার নৃপতিগণ সেই নিয়মের উচ্ছেদ সাধন করিতে যত্নবান হইলেন এবং অচিরকালমধ্যেই "আর কেহ অন্য জাতীয় কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে না" ইহাই বিধিবদ্ধ হইয়া গেল। এই যে অভিনব বাবুসম্প্রদায় বালিকা-

বিবাহের প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়া যুবতীবিবাহের জন্য লালায়িত হইয়াছেন, ইহাও এক সময় ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। এক্ষণে যে সকল দেশে যুবতী-বিবাহ প্রচলিত আছে, সময়ান্তরে তদ্দেশবাসীগণও যে ইহার দোষগুণ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিবে, এমন নয়। ভগবানের অনুগ্রহে আরও যদি তাহারা সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে পারে, তবে তাহাদের মধ্যেও একসময় বালিকাবিবাহ নয়নগোচর হইবে। বর্ত্তমান বাবুগণ স্ত্রীকে অশিক্ষিতা অবস্থায় নিজগৃহে স্থান প্রদান করিতে সাতিশয় লজ্জা বা অপমান মনে করেন। এস্থলে শিক্ষা শব্দের অর্থ লেখাপড়া নয়। সামান্য বোধোদয় পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া বালিকাগণ যতদূর লেখা পড়া শিখিতে পারে, তাহা অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। বালিকাগণ দীর্ঘকাল পিত্রালয়ে থাকিয়া, শ্বশুর শাশুড়ীর সমক্ষেই যদি স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিতে না শিখিল, পরিণয়ের পরদিনই যদি পরিবারস্থ দশজনের প্রতি বিদ্বেষ জন্মাইয়া স্বামীকে দেশান্তরিত করিতে না পারিল; বারবিলাসিনীর ন্যায় কি প্রকারে স্বামীর মনস্তুষ্টি সাধন করিতে হয়, কি প্রকারে স্বামী সহবাস করিতে হয়, এবং কেমন করিয়াই বা প্রসব-যন্ত্রণাদি অনায়াসে সহ্য করিতে পারা যায়, ইত্যাদি বিষয়ে যদি সম্পূর্ণরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া পতিগৃহে

পদার্পণ করিতে না পারিল, তবে আর তাহাদিগকে শিক্ষিতা বলা যায় কি প্রকারে? তাহা না হইলে হতভাগ্য স্বামীগণই বা সৌভাগ্য মনে করিবেন কেন? হা ভগবন্! আর কতকাল এই সমস্ত পাপকথা কর্ণ-গোচর করিতে হইবে? এক্ষণে শীঘ্র শীঘ্র হিন্দুনাম বিলুপ্ত হইলেই মঙ্গল। ভাই বাবুগণ! তোমরা সময়োচিত কর্ম্মই করিতেছ। এতদ্বিষয়ে তোমাদের প্রতি দোষারোপ করা মিথ্যা। এক সময় যে পৃথিবীতে বাবুনামক একপ্রকার অদ্ভুত জীব জন্মগ্রহণ করিবে, সংসার হইতে বর্ণভেদ উঠিয়া যাইবে, তাহা বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যঋষিগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তবে সময় সময় নিতান্ত অসহ্য হয় বলিয়াই আমাদিগের ন্যায় কতিপয় ভ্রান্ত হিন্দু ঋষিবাক্যের অবমাননা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। এই নব্যমতে, বাল্য-বিবাহের জন্যই হিন্দুবিধবার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, একটী প্রবাদ উঠিয়াছে। এই বিষয় লইয়াও এক সময় ভারতবর্ষে ঘোর আন্দোলন চলিয়াছিল এবং সেই আন্দোলনের জন্যই মঙ্গলপ্রদ জ্যোতিষশাস্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। সংসারে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় স্ত্রীপুরুষ আছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাহাকে গণ কহে। যদি জ্যোতিষানু-মোদিত গণানুসারে শুভলগ্নে বিবাহকার্য্য সম্পাদন করা যায়, তবে সেই বিবাহে কখনও অমঙ্গল হইতে

পারে না। এইজন্যই পূর্ব্বতন হিন্দুগণ জ্যোতিষোক্ত গণাদি জ্ঞাতব্য বিষয় সকল পরিজ্ঞাত হইবার জন্য আপন আপন সন্তানদিগের এক একখান কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। তদ্দারা যে পুরুষের সহিত যে রমণীর বিবাহ-কার্য্য সম্পাদিত হইলে পরিণামে শুভফলোৎপাদন করিবে, তাহা তাঁহারা জানিতে পারিতেন এবং তজ্জন্যই নিতান্ত শৈশবাবস্থায় বিবাহ হইলেও দম্পতীগণ আজীবন জাত্যনুযায়ী সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। অধুনা নূতন সভ্যতার নূতন স্রোতে সেই সকল বিষয় ভাসিয়া গিয়াছে। এখন আর শাস্ত্রানুমোদিত প্রকৃত বিবাহ কাহারও হয় না, সুতরাং এখনকার বিবাহে যে অশুভ ফলোৎপত্তি হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? যাহা প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রবিরুদ্ধ, যদ্দারা হিন্দুসমাজের ঘোর অনিষ্ট হইতেছে, সেই জঘন্য কন্যাবিক্রয়, বহুবিবাহ এবং বরপক্ষের অবৈধ অর্থগ্রহণ প্রভৃতি দুষ্কার্য্যগুলির প্রতি কেহই ভ্রূক্ষেপ করেন না। যাহাতে দোষের লেশ-মাত্রও নাই, তাহাই লইয়া সকলে সর্ব্বদা আন্দোলন করিয়া থাকেন। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে এমনই ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে, যে কেহ বা প্রাণসমা দুহি-তাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিতে না পারিয়া চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতেছেন, কেহ বা একমাত্র বংশধর পুত্র-

রত্নেরও বিবাহ সম্পাদনে অক্ষম হইয়া বংশ লোপ করিতেছেন। কত শত ধনী কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া দিন দিন একবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছেন, আবার কত শত দরিদ্র কন্যা বিক্রয় করিয়া বিপুল ধনের অধিকারী হইতে-ছেন। আবার কোন কোন পশ্বাচারী যুবক এক কালে বহুভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিয়া হতভাগিনীদিগকে চিরকাল পিতৃগৃহে ফেলিয়া রাখিতেছেন। যত দিন এই সকল পাপকার্য্যের যথোচিত প্রতিবিধান না হইবে, যত দিন এই সকল জঘন্য বিষয়ে সাধাবণের দৃষ্টি আকমণ না কবিবে, তত দিন বাল্য-বিবাহই হউক, আর যুবর্তী-বিবাহই হউক, কিছুতেই হিন্দুসমাজের মঙ্গল বিধান হইবে না। সুতরাং আমার বিবেচনায় এই সকল বিবয়ে সর্ব্বাগ্রে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করা উচিত।

সম্পূর্ণ।